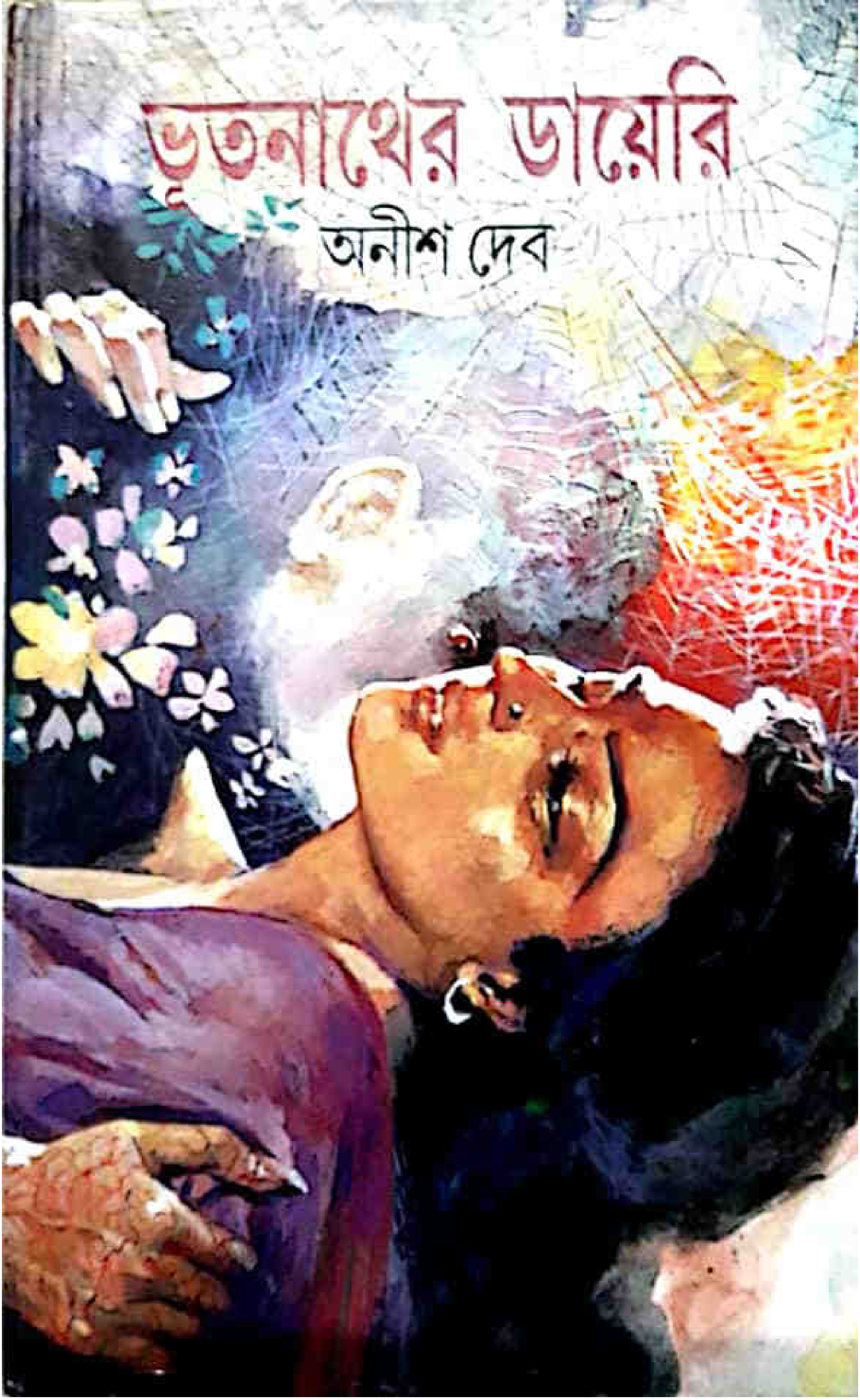

ভূতনাথের ডায়েরি
অনীশ দেব

ভূতনাথের ডায়েরি

অনীশ দেব



ভাষা
ও
সাহিত্য

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

ভূতনাথের ডায়েরি



আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আমার কৌতূহল ও আগ্রহের শুরু। ছোটবেলা থেকেই ভূতে আমার ভীষণ ভয়। অশরীরী, অলৌকিক, ভূত, প্রেত, পিশাচ আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিত। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যখনই এ-জাতীয় কোনও কাহিনী শুনতাম তখনই খুব ভয় পেতাম। পরে, বড় হয়ে, কাঠমাণ্ডুর এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি ভূত-প্রেতের ভয় কাটানোর জন্য অভিনব এক পথ ধরি : ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো।

সুতরাং সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস থেকেই আমার ভূতচর্চার কাজ শুরু হয়েছে। আজ, এই পরিণত বয়েসে এসেও সে-কাজ থামেনি। এই তিন যুগ সময়ে কখন যেন আমার নাম 'প্রিয়নাথ'-এর বদলে 'ভূতনাথ' হয়ে গেছে। সমবয়েসী বা গুরুজনরা সামনেই 'ভূতনাথ' বলে ডাকেন। আর, ছোট যারা, তারা বলে আড়ালে। আমি তাতে কিছু মনে করি না। বরং বেশ মজা পাই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে ভূত-প্রেত, অশরীরী-অলৌকিক নিয়ে আমার কম অভিজ্ঞতা হল না। তাছাড়া ভূত-প্রেতের বহু কাহিনীও আমি শুনেছি। সেই সব অভিজ্ঞতা ও কাহিনী আমি যত্ন করে লিখে রেখেছি বারোটা মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায়—অনেকটা ডায়েরির মতন। মাঝে মাঝে সেই খাতাগুলোর পাতা উলটে স্মৃতিচারণ করি।

সম্প্রতি আমার আলাপ হয় এক কলমচীর সঙ্গে। আলাপ করে জানলাম, তিনি নাকি বানিয়ে-বানিয়ে ভূতের গল্প লেখেন। তখন আমি হেসে আমার খাতাগুলোর কথা তাঁকে বলি। শুনে তাঁর উৎসাহ দ্যাখে কে। আমার মিনমিনে ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি খাতাগুলো নিয়ে যান। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'ডায়েরির লেখাগুলো ঘষে-মেজে কল্পনার প্রলেপ দিয়ে সামান্য রদবদল করে একে-একে আমি লিখব। আপনার কোনও আপত্তি শুনব না।'

ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তাই একরকম স্নেহের বশেই তাঁকে আমি অনুমতি দিয়েছি। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠায় কাহিনীগুলো বন্দি না থেকে সকলের সামনে প্রকাশ করলে ক্ষতি কী।

অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে

'প্ল্যানচেট' শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল জানি না, তবে তাকে আমি দোষ দিতে চাই না। কারণ সে-রাতে শেষ পর্যন্ত যা হয়েছিল তার জন্যে আমরা কেউই দায়ী ছিলাম না। দায়ী ছিল একমাত্র নিয়তি।

ঘটনার শুরু সায়েন্স কলেজের ক্যান্টিনের আড্ডা থেকে।

পি-কে-সি-র ক্লাস কেটে আমরা পাঁচজন চায়ের কাপ সামনে রেখে 'টাইটানিক' নিয়ে তুমুল তর্ক করছিলাম। বিষয় ছিল কেট উইনস্লেট বেশি সুন্দর দেখতে, না মাধুরী দীক্ষিত।

হঠাৎই রমেশ তিওয়ারি বলে উঠল, 'পরশু আমি জুমেলিয়াকে স্বপ্নে দেখেছি—।'

আমাদের আড্ডা 'ঝুপ' করে থেমে গেল। সবাই চুপ।

কারণ জুমেলিয়া তিনমাস আগে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ও আমাদের সঙ্গেই পড়ত। মাস তিনেক আগে আমরা, মানে বি. টেক. থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা, শৌনকদের মাহিকেলনগরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দলে আমরা মোট সতেরোজন ছিলাম। পিকনিকটা ছিল একেবারেই আমাদের নিজেদের ব্যাপার—ফলে কোনও স্যার-ট্যার সঙ্গে যাননি। শীতের ছুটির দিনটা আমাদের দারুণ কেটেছিল।

টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে নাচ-গান। স্যারদের ক্যারিকেচার। ব্যাডমিন্টন, তাস, জমাটি আড্ডা। একটু-আধটু নেশা করা। তারপর কব্জি ডুবিয়ে মাংস-ভাত। দিনটা সবাই দারুণ এনজয় করেছিল।

তা ছাড়া শৌনকদের বাগানবাড়িটাও ছিল চমৎকার। বিশাল গাছ-গাছালির বাগান, আর তার সঙ্গে প্রকাণ্ড মাপের দোতলা বাড়ি। কলকাতায় যে-নির্জনতার দেখা পাওয়াই ভার, এখানে তাকে দ্যাখে কে! তাই হারিয়ে যাওয়ার কোনও মানা ছিল না। জোড়ায়-জোড়ায় অনেকে হারিয়েও গেছি।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে দুটি কারণে।

সেদিন আমি সুছন্দাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম।

আর, ফেরার সময় যশোর রোডের ওপর জুমেলিয়া অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।

সেদিন ওর সিগারেট খাওয়ার ঝোঁক চেপেছিল। একে তো পিকনিকে হল্লোড়

করে এক-দু-পেগ খেয়ে একটু টিপ্‌সি ছিল, তার ওপর একটু জেদী—তাই ফেরার পথে জেদ ধরল এক্ষুনি ওর ক্লাসিক সিগারেট চাই।

আমাদের কারও সঙ্গে ক্লাসিক ছিল না। আমরা অন্য ব্র্যান্ড ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর সেই এক কথা, 'আমার বাপি ক্লাসিক ছাড়া খায় না—আমারও ওই চাই—রাইট নাউ। সো স্টপ দ্য ব্লাডি বাস।'

বাস থামিয়ে জুমেলিয়া একা-একাই নেমে পড়েছিল। রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল একটা পান-সিগারেটের দোকানে। তারপর ফেরার সময় একটা ট্রাক ওর সিগারেট খাওয়ার সাধ চিরজীবনের মতো শেষ করে দিল।

ট্রাকটার একটা হেডলাইট খারাপ ছিল, আর জুমেলিয়ার নজর ছিল ঝাপসা। ফলে চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল।

জুমেলিয়ার সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বাপ্পাদিত্যর 'ইয়ে' আছে। কিন্তু বাপ্পা নিজেও সেদিন একটু-আধটু আউট ছিল। তার ওপরে জুমেলিয়া হল বড়লোক বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে—আদুরে এবং জেদী। সুতরাং ওর ভবিতব্য কেউ বদলাতে পারেনি।

নির্জন শীতের রাস্তায় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের সাঙ্ঘাতিক এক ধাক্কা দিয়েছিল। আমরা পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

বাপ্পাদিত্য প্রায় দু-মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনওরকমে সামলে উঠেছে। এখনও ও প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে, ক্লাসের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। সবকিছু ভীষণ ভুলে যায়। অথচ ও পড়াশোনায় দারুণ ছিল। বি. টেক. পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু মিলিয়ে ওর র‍্যাঙ্ক সেকেন্ড। জানি না, ফাইনাল ইয়ারে কীরকম রেজাল্ট করবে।

জুমেলিয়ার থেঁতলানো দেহটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। ওর ফরসা সুন্দর মুখটা অটুট ছিল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওর মুখ দেখে মনেই হয়নি ও আর নেই। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। অপলক দু-চোখে অনেক সাধ ও স্বপ্ন। আর ঠোঁটের বাঁদিকে ছোট্ট কালো জড়ুলটা বরাবরের মতোই সুন্দর। বাপ্পা ওই জড়ুলটার জন্যে পাগল ছিল।

আমরা পাঁচজনই সেই পিকনিকে ছিলাম। আমি, বাপ্পা, রমেশ তিওয়ারি, শৌনক, আর ঐন্দ্রিলা।

রমেশের কাণ্ডজ্ঞান বেশ কম। যখন যা মনে হয় হটহাট করে বলে দেয়। যেমন, এখন। বাপ্পার অবস্থা জেনেশুনেও ও ফস করে জুমেলিয়ার কথা তুলে বসল। তা ছাড়া, আমরা অনেকেই জানি, জুমেলিয়ার ব্যাপারে তিওয়ারির ইন্টারেস্ট ছিল। ভালো করে বাংলা শেখার জন্যে ও আমাকে আড়ালে বহুবার ধরেছে। বলেছে, 'রঙ্গন, ইয়ার, আমাকে দো-তিন বাংলা লাভ ডায়ালগ শিখিয়ে দে।'



আমি হেসে জানতে চেয়েছি, 'কেন? কোথায় অ্যাপ্লাই করবি?'

জুমেলিয়ার কথা তিওয়ারি আর বলতে পারেনি। কারণ ও জানত, বাপ্পাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এমনকী ঐন্দ্রিলাও বাপ্পাকে মনে-মনে চাইত। পরে শৌনকের সঙ্গে ওর রিলেশান হয়।

তিওয়ারি জুমেলিয়ার কথা বলামাত্রই আমাদের আলোচনার বিষয় পালটে গেল। আলোচনা শুরু হল পিকনিক আর জুমিকে নিয়ে।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে-মনে চাইছিলাম এ-আলোচনা বন্ধ হোক, কিন্তু তা হয়নি। ধাপে-ধাপে আলোচনা পৌঁছে গেল আত্মা, প্রেতাত্মা, প্ল্যানচেট, সিয়াঁস, প্রেতচক্র, এইসবের দিকে। তবে 'প্ল্যানচেট' শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল তা আমার মনে নেই।

ঐন্দ্রিলা এক চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে বলল, 'আমার বড়জেঠু ছোটবেলায় খুব প্ল্যানচেট করতেন। নামকরা সব লোকদের নাকি ডেকে আনতেন। একবার নাথুরাম গডসে-কে ডেকেছিলেন। তখন অন্ধকার ঘরের মধ্যে গুলির শব্দ শুনেছিলেন—।'

শৌনক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'যত্ত সব লাটাই-ঘুড়ি! আর-একটু তোল্লাই দিলেই বলবি মহাত্মা গান্ধীর "হা রাম!" কথাটাও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।'

ঐন্দ্রিলা রীতিমতো খেপে গিয়ে বলে উঠল, 'প্ল্যানচেটের তুই কী বুঝবি! তোর কাছে তো সবকিছু ট্যান হয়ে বেরিয়ে যায়।'

আমি ওদের শান্ত করার জন্যে বললাম, 'তোরা যা-ই বল, প্ল্যানচেট ব্যাপারটা বোধহয় একেবারে বোগাস নয়। আমি একজনকে জানি...।'

বাপ্পা আমাকে বাধা দিল : 'আমি জুমিকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছি না।'

কথা বলতে-বলতেই বাপ্পা মাথা নিচু করল, চোখ বুজে চোখের কোণ আঙুলে টিপে ধরল। ওর পিঠটা বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না যে, বাপ্পা কাঁদছে।

ঐন্দ্রিলা বাপ্পার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, বিষণ্ণ গলায় বলল, 'অন্য কথা ভাবার চেষ্টা কর। জুমি তো আর নেই। ওর কথা ভেবে শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছিস।'

আমি আর শৌনক বাপ্পাকে বোঝাতে লাগলাম। ওর মনটা বড্ড নরম আর সাদাসিধে—ঠিক কচি কলাপাতার মতো—অল্পেতেই আঁচড় পড়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর বাপ্পা নিজেকে সামলে নিয়ে ভারি গলায় বলল, 'আমার কপালটাই খারাপ! জুমিকে যদি একটিবার দেখতে পেতাম!'

শৌনক আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই ও ক্যান্টিনের বেঞ্চি ছেড়ে

উঠে এল বাপ্পার খুব কাছে। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'

বাপ্পা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আমরাও খানিকটা বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের চোখে।

শৌনক আবার বলল, 'একটা কথা তোকে জিগ্যেস করব?'

'কী কথা?' বাপ্পা জানতে চাইল।

'জুমেলিয়াকে একবার দেখতে পেলেই তোর সাধ মিটবে?'

বাপ্পা অস্বাভাবিক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—।'

রমেশ এতক্ষণ গোবেচারাভাবে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এইবার বলে উঠল, 'ক্যায়সে দেখা যাবে?'

আমি আর ঐন্দ্রিলাও মুখে-চোখে একই প্রশ্ন ফুটিয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের দিকে।

শৌনক বাপ্পাকে আড়াল করে ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল। তারপর বলল, 'আমরা পাঁচজন মিলে প্ল্যানচেটে বসব। ঐন্দ্রিলা মিডিয়াম হবে। জুমেলিয়ার সঙ্গে ওর ভালোরকম দোস্তি ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, প্ল্যানচেটে জুমেলিয়া দেখা দেবে।'

আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু আগেই যে প্রেতচক্র নিয়ে ঐন্দ্রিলাকে ঠাট্টা-তামাসা করে নাজেহাল করছিল সে হঠাৎ সিরিয়াসলি প্রেতচক্রের কথা ভাবছে! আর শুধু তা-ই নয়, জুমেলিয়া যে দেখা দেবে সে-কথাও প্রায় নিশ্চিতভাবে বলছে!

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আমি ওতে নেই। প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার ফান্ডা নেই।'

তিওয়ারি বলল, 'রঙ্গন, তুই বেকার ঘাবড়াচ্ছিস। ভূতে আমার জবরদস্ত ফান্ডা আছে।'

পৃথিবীতে হেন কোনও বিষয় নেই যাতে রমেশ তিওয়ারির ফান্ডা নেই। সাধে কি আমরা ওকে 'ফান্ডামেন্টাল তিওয়ারি' বলে খ্যাপাই!

ঐন্দ্রিলা বলল, 'তিওয়ারির ফান্ডার ওপরে ঠিক রিলাই করা যাবে না। রঙ্গন, তুই ব্যাপারটা নিয়ে একটু পড়াশোনা কর। আমি তোকে প্রচুর বইপত্র দেব। তোর হোমটাস্ক হয়ে গেলে আমরা কাজে নামব।'

আমি বাপ্পাকে দেখছিলাম। ওর মুখচোখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। জুমেলিয়াকে একটিবার দেখার জন্যে ও সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

তিওয়ারি বলল, 'রঙ্গন পড়াশোনা করে করুক, হামি ভি থোড়াবহৎ স্টাডি করে আসব। কিন্তু কোথায় বসে প্ল্যানচেট করবি?'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করতেই শৌনক বলল, 'মাইকেলনগরে আমাদের বাগানবাড়িতে হবে। জায়গাটা জুমির হেভি পছন্দ ছিল।'

আমি বললাম, 'প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা রাতে হলেই ভালো হয় বলে শুনেছি। যদি সেটাই হয়, তা হলে সে-রাতে আমরা ফিরতে পারব না। ঐন্দ্রিলা কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে? কাকিমা কি পারমিশান দেবেন?'

শৌনক অন্যরকম করে হাসল, বলল, 'আমি যখন আছি তখন পারমিশান পাওয়া যাবে। আমরা তো ফাইনাল পরীক্ষার পরই সেট্‌ল করব। কী বল, মিতি?'

'মিতি' ঐন্দ্রিলার ডাকনাম। শৌনক মাঝে-মাঝে ওকে এই নামে ডাকে। মজা করে বলে, 'ওর ডাকনামটা জ্যামিতি থেকে এসেছে।'

ঐন্দ্রিলা বলল, 'মাম্মির প্ল্যানচেটের ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। তা ছাড়া জুমিকে চিনত। জুমি আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিল। জুমিকে প্ল্যানচেট করা হবে শুনলে মাম্মি হয়তো আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।'

শৌনক একেবারে হাততালি দিয়ে উঠল : 'তা হলে তো দারুণ হবে! কাকিমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে—ঠিক পিকনিকের মতন...।'

বাপ্পাদিত্য বিড়বিড় করে বলল, 'জুমেলিয়াকে যদি দেখাতে পারিস, তোদের কাছে আমি এভার গ্রেটফুল থাকব।'

ঐন্দ্রিলা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'রঞ্জন, কাল থেকে তোমার প্ল্যানচেটের প্রজেক্ট শুরু—কালই আমি বড়জেঠুর কাছ থেকে একগাদা বইপত্র চেয়ে নিয়ে আসব।'

ব্যাপারটা সেদিন পিকনিক গোছের শুনিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোটেই সেরকম হয়নি।

ঐন্দ্রিলার দেওয়া বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঘটনার দিন ঐন্দ্রিলা ওর মায়ের সঙ্গে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হল।

মাইকেলনগর যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার—ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আগ্রহের সীমা নেই। প্রেতাত্মাচর্চায় একেবারে ওস্তাদ মানুষ। ঐন্দ্রিলার বড়জেঠুর খুব বন্ধু। আমাদের প্ল্যানচেটের মতলবের কথা জানতে পেরে নিজেই আগ বাড়িয়ে সঙ্গী হতে চেয়েছেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের মাথায় কপাল থেকে শুরু করে বেশ বড় মাপের টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দীর্ঘ সৌম্যকান্তি ফরসা চেহারা। পরনে গাঢ় রঙের প্যান্ট আর নীল-সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। পুরু ঠোঁটে সিগারেট।

ওঁকে দেখে সিনেমা বা নাটকের লোক বলে মনে হয়। ভূত-প্রেতের সঙ্গে ওঁর যে কোনওরকম সম্পর্ক থাকতে পারে তা অনুমান করা এককথায় অসম্ভব।

এরকম একজন বিচিত্র সঙ্গী পেয়ে মাইকেলনগর যাওয়ার পথে সময়টা দারুণ কাটল।

প্রিয়নাথের ভরাট গলা, আর কথাও বলেন ভারি চমৎকার। আমরা জুমির ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়েছিলাম। এখন জুমিকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা বলছিলাম। শুধু বাপ্পা চুপচাপ বসে ছিল, আর ঐন্দ্রিলাও ওর মায়ের পাশে বসে কেমন যেন আনমনা, উদাস—দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে জটিল কোনও অঙ্ক কষছে।

প্রিয়নাথ তখন বলছিলেন, 'জানো তো, ভূতচর্চা করি বলে সবাই আমার নাম দিয়েছে ভূতনাথ। তবে ওতে আমি কিছু মাইন্ড করি না। কোনও কিছু নিয়ে গবেষণা করাটা তো আর খারাপ না! এই ধরো না, এ-লাইনে না এলে আমি মাইকেল ফ্যারাডের ভূতের কথা জানতেই পারতাম না...।'

'মাইকেল ফ্যারাডের ভূত!' তিওয়ারি আর আমি অবাক হয়ে বললাম।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও মাইকেল ফ্যারাডের ভূত। ব্যাপারটা প্রথম রিপোর্টেড হয় ১৯৬২ সালে। রিপোর্ট করেছিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর এরিক লেইথওয়েট। লন্ডনের রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ টের পেলেন তাঁর কাছে ফ্যারাডের ছায়া-শরীর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যারাডের প্রেত তাঁকে যেন বলল, "নাউ ইট্স অলরাইট, ল্যাড। য়ু আর ডুয়িং ফাইন।" লেইথওয়েট যখন অন্য বিজ্ঞানীদের এ-কথা জানালেন, তখন অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁদেরও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ১৮১৩ সালে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে ফ্যারাডে স্যার হামফ্রি ডেভির ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে, ১৮৩৩ সালে, তিনি ডেভির জায়গায় প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হয়েছিলেন।'

হাতের সিগারেটে বেশ কয়েকবার টান দিয়ে প্রিয়নাথ সেটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, 'লেইথওয়েটের ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। ১৯৬৪ সালে ক্রিসমাসের ছুটিতে লেইথওয়েট আবার রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে যান। উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া। এ-ধরনের বক্তৃতামালার ব্যাপারটা ফ্যারাডে নিজেই একসময় শুরু করেছিলেন। তো বক্তৃতার মাঝে একদিন লেইথওয়েট দর্শকদের সামনে একটা পরীক্ষা সরাসরি করে দেখাতে চাইলেন। দুটো তারের কয়েল নিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকঠাক হলে কয়েলে কারেন্ট পাঠানোমাত্রই একটা প্লেট থেকে একটা বল ছিটকে লাফিয়ে উঠবে। আর যদি ঠিক সময়ে কারেন্ট পাঠানো না

হয় তা হলে বলটা প্লেটের ওপরে শুধু এপাশ-ওপাশ ঠকঠক করে কাঁপবে—লাফিয়ে উঠবে না।

'তো লেইথওয়েট দু-বার পরীক্ষাটা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাকসেসফুল হলেন না। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না—কারণ, লেইথওয়েট অঙ্ক কষে দেখেছিলেন এক্সপেরিমেন্টটা ৬৯৬ বার চেষ্টা করলে একবার মাত্র সফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি আবার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ঠিক তখনই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। লেইথওয়েটের কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, তৃতীয়বারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হবে। ইচ্ছে করলে লেইথওয়েট আগেভাগেই সেটা দর্শকদের জানিয়ে দিতে পারেন। লেইথওয়েট ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কী ভেবে তিনি সত্যি-সত্যিই দর্শকদের আগাম জানিয়ে দিলেন যে, এইবার পরীক্ষাটা সফল হবেই।'

একটু থামলেন প্রিয়নাথ। তারপর ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'সত্যি-সত্যিই থার্ডবারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছিল।'

কাকিমা—মানে, মিতির মা—জিগ্যেস করে বসলেন, 'কানে-কানে কে ওইরকম কথা বলেছিল?'

প্রিয়নাথ এবার শব্দ করে হাসলেন : 'সেটাও কি আর বলতে হবে!'

আমি মাইকেল ফ্যারাডের কথা ভাবছিলাম, কোথা থেকে জুমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম জুমেলিয়া আমাকে বলছে, 'চটপট কর—তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি যে ছটফট করছি।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যশোর রোড থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে আমাদের গাড়ি মাইকেলনগরে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার কখন যেন পা টিপে-টিপে নেমে এসেছে। রাস্তার সামান্য আলো কিংবা ছোটখাটো দোকানপাটের আলো তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, অন্ধকার যেন শিকারী বাঘের মতো গাছ-গাছালির মাথায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে—সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সব গ্রাস করবে।

প্রিয়নাথ বললেন, 'তোমরা সবাই জুমেলিয়ার কথা ভাবো। প্ল্যানচেট সাকসেস-ফুল হওয়ার জন্যে এটা খুব জরুরি।'

শৌনক বলল, 'আমরা তো রাত দশটায় বসব। তা হলে এখন থেকেই ভাবার কী দরকার!'

মিতি ওকে প্রায় বকুনি দিয়ে বলল, 'এসব ব্যাপারে আঙ্কল এক্সপার্ট। আঙ্কল যা বলেন তা-ই শুনবি।'

তিওয়ারি বলল, 'আমি কিন্তু শুরুসেই তনমন দিয়ে জুমির কথাই ভাবছি।

খেয়াল করেছিস, আমরা ওর অ্যাক্সিডেন্টের স্পটের ওপর দিয়েই এলাম।'

ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-কথা আর মুখে উচ্চারণ করিনি। কিন্তু রমেশটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই! দেখলাম, বাপ্পা দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

শৌনকদের বাগানবাড়ির পাশের মাঠে গাড়ি রেখে আমরা লোহার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শৌনকের ডাকে বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার মতিলাল এসে তালা খুলে দিল। দরজার পাল্লা ঠেলতেই গা-শিউরে-ওঠা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাত্র তিনমাস আগে এই বাগানবাড়িতে এসে আমরা কত হইহুল্লোড় করে গেছি। তখন জায়গাটাকে দারুণ লেগেছিল। অথচ আজ এখানে ঢুকতেই কীরকম যেন গা ছমছম করছে।

বাগানের গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে এগোতে-এগোতে শৌনক প্রিয়নাথকে লক্ষ করে বলল, 'আঙ্কল, আজ আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই।' তারপর ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়ে : 'কী বল, মিতি?'

ঐন্দ্রিলা আনমনাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, হতেও পারে।'

প্রিয়নাথ শৌনককে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কী করে এত শিওর হচ্ছ বলো তো? তুমি কি কিছু ফিল করছ? অনেক সময় প্রেতাত্মারা আসার আগে মনের ওপর ছাপ ফেলে জানান দেয়।'

শৌনক খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, 'না, সেরকম কিছু না—এমনি মনে হচ্ছে।'

প্রিয়নাথ আর কোনও কথা বললেন না। তবে ওঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ যেন চোখে পড়ল।

আমরা শৌনকদের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

প্রায় দেড়কাঠা জুড়ে দোতলা বাড়ি। শৌনকের দাদুর নামে বাড়িটার নাম রাখা হয়েছে 'ভুজঙ্গ নিবাস।' বাড়িটার বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। বাড়িতে ঢুকেই কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। প্রথমে আমাদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা, তারপর রাতের আয়োজন। আমরা সাতজন যে আজ এখানে আসব, থাকব, সে-কথা মতিলালকে আগেই টেলিফোনে বলা ছিল। তাই সব ব্যবস্থাও আগেই করে রেখেছিল। কিন্তু কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হতেই প্রিয়নাথ ওদের ডাকলেন : 'মিসেস ঘোষ, এক মিনিট—একটু দাঁড়িয়ে যান।'

প্রিয়নাথ আঙ্কলকে ঘিরে আমরা ছ'জন দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাল্‌বের আলোয় বিশাল হলঘরে আমাদের লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েছে।

প্রিয়নাথ কখন যেন আমাদের দলপতি হয়ে পড়েছেন। একটু কেশে নিয়ে হাতঘড়ি দেখে তিনি বললেন, 'এখন ছ'টা বাজে। ঠিক ন'টায় আমরা খেতে

বসব। সেই বুঝে রান্নাবান্না করবেন। আর ঠিক দশটায় আমরা প্রেতচক্র শুরু করব। এ ছাড়া আর-একটা কথা—এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা জুমেলিয়ার কথা ভাবব, ওকে নিয়ে আলোচনা করব। তা হলে ও বুঝতে পারবে, ওকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আগে গোটা বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপর ঠিক করব কোন ঘরে বসলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। ব্যস, এবার আপনারা রান্নাঘরে যান। তবে সময়টা মনে রাখবেন—রাত ঠিক দশটায়, কাঁটায়-কাঁটায়।'

কাকিমা আর মিতি চলে যেতেই প্রিয়নাথ আমাদের বললেন, 'তোমরা বাড়িটায় ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারো, বই-টই পড়তে পারো, এ-ঘরে টিভি দেখতে পারো—শুধু বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না—এমনকী বাগানেও না। আর শৌনক, তুমি আমার সঙ্গে একটু থাকো, আমাকে একটু হেল্প করো।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে করে মাঝারি মাপের একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন। সেটা দেখে মিতি কী জিগ্যেস করতেই তিনি হেসে বললেন, 'ওতে ভূত নামানোর সরঞ্জাম আছে। আবার অনেক সময় ভূত তাড়ানোর জিনিসপত্তরও থাকে।'

ব্রিফকেসটা হলঘরের একপাশে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ শৌনকের সঙ্গে বাড়ি পরিদর্শনের কাজে এগোলেন।

ঠিক তখনই এরোপ্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

শৌনকদের বাগানবাড়িটা এয়ারপোর্টের এত কাছে যে, সবসময়েই এরোপ্লেন ওঠা-নামার বিকট শব্দ শোনা যায়।

বাপ্পাদিত্য হলঘরের একটা খোলা জানলার সামনে বসে ছিল। লক্ষ করলাম, জানলার বাইরেটা এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপ্পা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

তিওয়ারি হলঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। হঠাৎই আমার কাছে এসে বলল, 'অ্যাই, রঞ্জন—কুছ টের পাচ্ছে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না তো!'

ও চাপা গলায় বলল, 'আমি টের পাচ্ছে। আমি ঘরের ওই কোণটায় গিয়েছিল—ওই আলমারিটার পাশে। তো শুনলাম, কে যেন খুব সফ্‌ট্‌লি বলল, "রমেশ, আমি তোকে ফোন করব।" কী বলব তোকে...একদম স্পষ্ট জুমেলিয়ার গলা। রঞ্জন, ইয়ার, মেরা তো ডর লগ রহা হ্যায়।'

আমি তিওয়ারিকে ইশারায় চুপ করতে বললাম। আমার ভয় হচ্ছিল, বাপ্পা এ-কথা শুনতে পেলে আপসেট হয়ে পড়বে। কিন্তু তিওয়ারি কি ভুল বকছে? আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়নাথ আঙ্কল আমাদের সঙ্গে আছেন।'

তিওয়ারিকে দেখে মনে হল না খুব একটা ভরসা পেল। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে

টিভির সুইচ অন করে দিল। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল টিভির সামনে।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। শৌনকদের বাড়িটা আজ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। এ-বাড়ির সব ঘরেই সাধারণ বাল্‌ব—কোনও টিউব লাইট নেই। পিকনিকের দিন তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ বাল্‌বের আলো কেমন মলিন রহস্যময় লাগছে। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত দীর্ঘ মাপের বিকৃত সব ছায়া। আমাদেরই চেনা জিনিসের ছায়া, অথচ কেমন অচেনা লাগছে।

আবার একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে পড়ে গেল, জুমিরা গত বছর প্লেনে করে আন্দামান বেড়াতে গিয়েছিল।

কী আশ্চর্য! আমরা দেখছি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে-কোনও প্রসঙ্গে জুমেলিয়াকে জড়িয়ে ফেলছি! তিওয়ারি কি তা হলে টেলিফোনের কথা ভাবছিল? ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় ও প্রায়ই জুমিকে ফোন করত।

এমন সময় টেলিফোনের রিং শুনতে পেলাম। দোতলায় ফোন বাজছে। তিওয়ারি আর বাপ্পাকে বলে আমি দোতলায় রওনা হলাম। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন শীত-শীত ভাবটা বাড়ছে। অথচ পথে আসার সময় শীত খুব একটা টের পাওয়া যায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা ছোট মাপের ঘর। সে-ঘরেই টেলিফোনটা রাখা আছে। ঘরে পা দিয়েই দেখি শৌনক রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই চোখ টিপে বলল, 'নে, তোর ফোন। সুছন্দা।'

সুছন্দা এখানে ফোন করবে জানতাম। তাই টেলিফোনের শব্দ পেয়েই ওপরে রওনা হয়েছিলাম। ফোনে কথা বলতে-বলতেই নজরে পড়ল, পাশের ঘরে প্রিয়নাথ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করে কীসব করছেন। শৌনকের দিকে তাকাতেই ও ইশারা করে বলল, ওই ঘরটাকেই প্রিয়নাথ প্ল্যানচেটের জন্যে পছন্দ করেছেন।

আমি জানি, ওই ঘরটার পরেই আছে লম্বা বারান্দা। আর তার পাশেই কাদের যেন বিশাল বাগান। সেই বাগানে গাছ আর আগাছা সমান দাপটে রাজত্ব করে।

সুছন্দার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকারে জোনাকি পোকার আলো চোখে পড়ছিল। আর কেন জানি না, জুমেলিয়ার কথা খুব মনে পড়ছিল।

বাল্‌বের আলোয় দেওয়ালে আমার ছায়া নড়ছিল। সেই বিচিত্র ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার মন হঠাৎই বলে উঠল, 'আজ রাতে জুমির সঙ্গে দেখা হবে।'

অন্ধকারে, হাতে হাত ধরে আমরা জুমেলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

একটা টেবিলকে ঘিরে আমরা ছ'জন চুপচাপ বসেছিলাম, আর প্রিয়নাথের নির্দেশ মতো জুমেলিয়ার কথা ভাবছিলাম।

ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ। এক কোণে একটা কাঠের বাক্সের আড়ালে একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো দেওয়ালে পড়ে আবছা একটা আলোর আভা তৈরি করেছে। আলোটা যাতে মলিন হয় সেজন্যে প্রিয়নাথ আড়ালের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সামনে টেবিলে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর কম্পাস রয়েছে। মাঝে-মাঝে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথ সে-দুটোর রিডিং দেখছেন। প্রিয়নাথের পাশেই বসেছে বাপ্পাদিত্য—ওর সামনে একটা বড় সাদা কাগজ আর পেনসিল।

প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বললেন, 'বাপ্পা, আমি বললেই তুমি পেনসিলটা হাতে তুলে নেবে, আলতো করে ধরে রাখবে কাগজের ওপরে—যাতে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কেউ তোমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে পারে।'

বাপ্পা চাপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু পেনসিল ধরতে গেলে তো আমাকে রঙ্গনের হাত ছেড়ে দিতে হবে।'

'ছেড়ে দেবে।' প্রিয়নাথ তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'রঙ্গন, তুমি তখন বাপ্পাকে টাচ করে থাকবে।'

বাপ্পার ডানপাশ থেকে আমি জবাব দিলাম, 'ও. কে.।'

'ব্যস, আর কোনও কথা নয়—।'

শৌনক জিগ্যেস করল, 'আমিও কি কাগজ-পেনসিল নেব?'

প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, 'না।' একটু থেমে তারপর : 'আমি নাম ধরে না ডাকলে কেউ সাড়া দিয়ো না। মিসেস ঘোষ, আপনিও না।'

আবার সব চুপচাপ।

একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লাগছে। যে-শৌনক কখনও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না, সবসময় প্ল্যানচেট ইত্যাদি নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে, সে যেন এই প্ল্যানচেটের ব্যাপারে এসে থেকেই অতি-আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর বারবার বলছে, আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই!

ঐন্দ্রিলা আমাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে নেই। কারণ, ও মিডিয়াম হয়েছে। প্রিয়নাথ ওকেই মিডিয়াম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কাকিমা এ-ব্যাপারে সামান্য খুঁতখুঁত করলেও শৌনক আর ঐন্দ্রিলার উৎসাহের কাছে তাঁর অনিচ্ছা ভেসে গেছে। তা ছাড়া প্রিয়নাথ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রিলাই সবচেয়ে ভালো মিডিয়াম হবে—কারণ, ও জুমেলিয়ার সমবয়েসী মেয়ে।

ঘরের সবচেয়ে গাঢ় অন্ধকার অংশে মিতি স্থির হয়ে বসে আছে। ওকে দেখতে না পেলেও ওকে আমরা অনুভব করতে পারছি। ওর হাত দুটো সরু সাদা সুতো

দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন প্রিয়নাথ। বাঁধার সময় তিওয়ারি বলেছে, 'এ কাচ্চে ধাগে তো স্যার টান মারলেই ছিঁড়ে যাবে!'

প্রিয়নাথ উত্তরে বলেছেন, 'ঐন্দ্রিলা তো আর নিজে-নিজে সুতো ছিঁড়বে না। যাকে আমরা ডাকছি সে যদি চায় তবেই সুতো ছিঁড়বে।'

আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে এরোপ্লেনের শব্দ। তবে বুকের ভেতর একটা টিপটিপ শব্দও যেন টের পাচ্ছিলাম।

হঠাৎই জোরে শ্বাস ফেলার মতো 'ফোঁস' করে একটা শব্দ হল। আর তারপরই আমাদের টেবিলটা সামান্য নড়ে উঠল।

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস ও থার্মোমিটার দেখলেন। আমিও সেদিকে চোখ রাখলাম। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে, আর থার্মোমিটারে উষ্ণতা ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস—প্রেতচক্রে বসার আগে যা ছিল প্রায় তাই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার বলেছিলেন, কোনও প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে কম্পাসের কাঁটা যে-কোনও দিকে মুখ করে অস্থিরভাবে ছটফট করতে থাকে। অনেক সময় বনবন করে পাক খায়। আর উষ্ণতা নামতে থাকে নীচের দিকে।

ফলে আমি একটু স্বস্তি পেলাম।

প্রিয়নাথ চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে মনে হল যেন, আচমকা শ্বাস টানার একটা শব্দ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ।

বাপ্পা বোধহয় টেনশান আর সইতে পারছিল না। প্রিয়নাথের নিষেধ না মেনেও ফিসফিসে স্বরে প্রশ্ন করল, 'কে, তুমি?'

আমাদের পাথর করে দিয়ে ফিসফিস করে কেউ জবাব দিল, 'হ্যাঁ—।'

শব্দটা একটানা সুরে দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল। যেন বিশাল কোনও বেলুন থেকে ধীরে-ধীরে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ উত্তেজিতভাবে ধমক দিয়ে বললেন, 'বাপ্পা, কী হচ্ছে!' তারপর অন্ধকার লক্ষ করে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরক্ষণেই যা দেখলাম তাতে আমার চেতনায় কেউ যেন ভারি একটা হাতুড়ি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

মিতি কখন যেন ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। মোমবাতির আলোর সামান্য আভায় ওকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কোন মিতি!

ও কালচে রঙের একটা চুড়িদার পরেছিল—সেটা এখন ভৌতিক আলখাল্লার

মতো লাগছে। ওর মুখে মূকাভিনেতাদের মতো সাদা রঙ মাখা। কেউ কি রঙ মাখিয়েছে, নাকি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওর মুখের এই চেহারা দাঁড়িয়েছে! ওর মুখের সাদা রঙের জন্যেই ওর ঠোঁটের বাঁ দিকে একটা কালো জড়ুল নজরে পড়ল—ঠিক জুমেলিয়ার মতো। কিন্তু মিতির মুখে তো কোনও জড়ুল নেই! হঠাৎ করে এ-জড়ুল এল কোথা থেকে!

হাত দুটো বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তুলে মিতি এপাশ-ওপাশ দুলছিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে ও বাপ্পাদিত্যর নাম ধরে ফিসফিস করে দু-বার ডেকে উঠল।

প্রিয়নাথ চাপা গলায় আদেশের সুরে বললেন, 'বাপ্পা, পেনসিল নিয়ে রেডি হও—।'

বাপ্পার হাত যে কাঁপছিল সেটা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। ও আমার হাত ছেড়ে পেনসিল নিয়ে তৈরি হল। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর কাঁধ ছুঁয়ে বসে রইলাম।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস আর থার্মোমিটার দেখলেন। সেখানে কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না। তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

উত্তরে ঐন্দ্রিলা খলখল করে হেসে উঠল।

কাকিমা একটা ভয়ের চিৎকার দিয়ে উঠলেন। টেবিলে খটখট করে কয়েকবার শব্দ হল। আমার বুকের ভেতরে একটা পাগল তখন দুরমুশ পিটছিল।

এমন সময় একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

শৌনকদের বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রতিটি প্লেনের শব্দ ঠিক একইভাবে ক্ষীণ থেকে শুরু হয়ে জোরালো হয়, তারপর গোঁ-গোঁ শব্দটা কমজোরি হয়ে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এইবারের শব্দটা আচমকা মাঝপথে থেমে গেল। কেউ যেন গলা টিপে একটা কথা-বলা পুতুলকে থামিয়ে দিল।

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনটা আকাশ থেকে গেল কোথায়! কিন্তু ভাবার আর সময় পেলাম না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি ঐন্দ্রিলা পাগলের মতো দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

সে কী মাথা ঝাঁকানি! যেন একটা 'মাথা-নাড়া বুড়ো' পুতুলের পা ধরে কেউ পাগলের মতো ঝাঁকাচ্ছে।

ওই অবস্থাতেই মিতি বাপ্পার নামটা ফিসফিস করে বলছিল।

বাপ্পা ডুকরে কেঁদে উঠল। কাগজের ওপরে ওর পেনসিল ধরা হাত খসখস শব্দে চলতে লাগল।

আর স্পষ্ট টের পেলাম ঘরের উষ্ণতা কমছে। ভীষণ শীত করছে আমাদের।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে থার্মোমিটার আর কম্পাস দেখলেন। ঘরের উষ্ণতা প্রায় ১০ ডিগ্রি, আর কম্পাসের কাঁটাটা বনবন করে ঘুরছে।

প্রিয়নাথ একরকম চিৎকার করেই জিগ্যেস করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

উত্তরে মিতি আবার খলখল করে হেসে উঠে অদ্ভুত চেরা গলায় বলল, 'এখনও তুই বুঝিসনি?'

পাশের ঘরের টেলিফোনটা হঠাৎই পাগলা-ঘণ্টির মতো বাজতে শুরু করল। এরকম দ্রুত লয়ে কখনও আমি টেলিফোন বাজতে শুনিনি।

একটা জানলা 'দড়াম' করে খুলে গেল। ঠান্ডা বাতাস সাপের মতো পাক খেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর প্রলয়নৃত্য নাচতে শুরু করল।

আমাদের অবাক করে দিয়ে বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে পড়ল অসংখ্য জোনাকি। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জোনাকি। অন্ধকার ঘরে আগুনের ফুলকি হয়ে ওরা ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল। ওদের এলোমেলো ভেসে বেড়ানো দেখে বাতাসের স্রোত বোঝা যাচ্ছিল।

তিওয়ারি আর্তনাদের মতো একটা শব্দ করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগজোগ্নি! ভাগজোগ্নি! জুগ্নু! জুগ্নু!'

ততক্ষণে ঠান্ডায় আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। আর কাকিমা 'মিতি! মিতি!' বলে ডেকে-ডেকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন।

মিতি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। হঠাৎই ও শক খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। টেলিফোনের ঘণ্টি তখনও কিন্তু থামেনি।

প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'শৌনক, লাইট জ্বেলে দাও।' তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গেলেন মোমবাতির কাছে। ওটা তুলে নিয়ে ঐন্দ্রিলার কাছে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঠিক কী যে হচ্ছিল মনে করে বলতে পারব না। শুধু মনে আছে এলোমেলো ভয়ের চিৎকার, কথাবার্তা, আর টেলিফোনের পাগলা-ঘণ্টি।

শৌনক ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এক মিনিট। সবাই শোনো। এসবে ভয়ের কিছু নেই। এই ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো নাটক।'

মুহূর্তে সব চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল। শৌনক ফোন ধরার জন্যে এগোতেই ফোনের ঘণ্টিও আচমকা 'চুপ' করে গেল।

আমরা সবাই তখন মিতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। ও চোখ বুজে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে মিতির!

ওর সারা মুখে সাদা রঙ। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জড়ুল আঁকা রয়েছে।

প্রিয়নাথ মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। শৌনক ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, 'আঙ্কল, আপনি উঠে পড়ুন। মিতির কিস্যু হয়নি। বাপ্পাকে একটু সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে আমি আর মিতি নকল ভূত নামানোর প্ল্যান করেছিলাম। ওর হাতব্যাগে মেকাপের জিনিস ছিল। অন্ধকারে লুকিয়ে মুখে মেখে নিয়েছে। আর জুমেলিয়ার এফেক্ট আনার জন্যে ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে জড়ুলটা এঁকে নিয়েছে।' কথা শেষ করেই শৌনক হো-হো করে হেসে উঠল : 'তবে সবাই যে এরকম ব্যাপক ভয় পেয়ে যাবে ভাবিনি।'

রমেশ তিওয়ারি হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। জোনাকিগুলোর দিকে দেখিয়ে আমতা-আমতা করে শৌনককে জিগ্যেস করল, 'তা হলে এই ভাগজোগ্‌নিগুলো কোথা থেকে এল?'

জোনাকিগুলো তখনও ঘরের ভেতর উড়ছিল। তবে ঘরের আলোয় ওদের অনেক নিষ্প্রভ লাগছিল।

শৌনক থতমত খেয়ে বলল, 'জানি না—।'

প্রিয়নাথ কপালে হাত চেপে মিতির পাশে উবু হয়ে বসেছিলেন। শৌনকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'টেলিফোনটা অমন পাগলের মতো বাজছিল কেন? প্লেনের গর্জনটাই বা মাঝপথে অমন থেমে গেল কেন? আর ঐন্দ্রিলা যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল মানুষ কি অমনভাবে মাথা ঝাঁকাতে পারে?'

শৌনক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বিব্রত অপরাধী মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কাকিমা মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ চিৎকার করে ওঁকে বাধা দিলেন : 'খবরদার, এখন ওর কাছে এগোবেন না!'

আমি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'শৌনক আর ঐন্দ্রিলা মিলে এসব কারসাজি করেছে? তা হলে টেম্পারেচার এরকম কমে গেল কেমন করে! বেশ শীত করছে...তা ছাড়া কম্পাসের নিড্‌লটাই বা অমন বনবন করে ঘুরছিল কেন?'

শৌনক বলল, 'টেবিলের শব্দগুলো আমি করেছিলাম। আর কথা ছিল, মিতি বাপ্পার নাম ধরে কয়েকবার ডাকবে। ও আর কিছু করেছে কি না আমি জানি না। ওকে ডাকুন—ও বলতে পারবে।'

ঐন্দ্রিলার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শৌনক ডেকে উঠল, 'মিতি! মিতি! ওঠ, সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে—।'

চিৎ হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ঐন্দ্রিলা কোনও সাড়া দিল না।

প্রিয়নাথ ওর কবজি ধরে বসেছিলেন। আমাদের ভয় পাওয়া মুখগুলোর দিকে একপলক নজর বুলিয়ে তিনি ভারি গলায় বললেন, 'ও আর উঠবে না। শি ইজ ডেড। আমি এতক্ষণ ধরে ওর পাল্‌স খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। যদি পারো

তো কেউ একজন ডাক্তার ডেকে আনো।'

প্রিয়নাথের কথায় আকুল ঝড় বয়ে গেল ঘরে।

শৌনক মিতির নাম ধরে পাগলের মতো ডেকে উঠে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কাকিমার বুকফাটা কান্না শুরু হয়ে গেল একইসঙ্গে। কিন্তু আবেগের ঝড় বেড়ে ওঠার আগেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, টেলিফোনটাও আগের অদ্ভুত ঢঙে হঠাৎই বাজতে শুরু করল। মোমবাতির আলোটা একবার কেঁপে উঠেই নিভে গেল। কিন্তু বাল্‌বের আলোয় আমাদের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

মিতির মৃতদেহের মুখটা ধীরে-ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে ওর টুকটুকে লাল ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গোল গর্তের চেহারা নিল। একটা অপার্থিব হাসি শোনা গেল ওর মৃতদেহের ভেতর থেকে। আর তারপরই একটা সবুজ রঙের মুখ দেখা গেল ওর মুখের গহ্বরে। ওর ঠোঁট চিরে মুখের গর্ত দিয়ে প্রাণপণ চাপে ঠেলে বেরিয়ে এল মাথাটা। গোটা মাথায় কেমন এক চকচকে লালা জড়ানো।

মাথাটা মাপে ছোট ফুটবলের মতো। চোখ দুটো টানা-টানা ঢুলু-ঢুলু। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। আর ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জড়ুল।

মাথাটা নেশাগ্রস্ত চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আমাদের একবার দেখল। তারপর ফিসফিসে হিমেল স্বরে বলল, 'বাপ্পা, এবার যাই।'

প্রিয়নাথ একলাফে ছিটকে চলে গেলেন ওঁর ব্রিফকেসের কাছে। কিন্তু তার বেশি কিছু করে ওঠার আগেই ঐন্দ্রিলার মৃতদেহ আচমকা চোখ খুলে তাকাল। এবং একটা 'ফট' শব্দ করে ঘরের বাল্‌বটা কেটে গেল।

ঘরের মধ্যে ভয়ার্ত চিৎকারের ঝড় উঠল আবার। আরও দুটো জানলা 'দড়াম' করে খুলে গেল। জানলার পাল্লাগুলো দেওয়ালে এলোপাতাড়ি বাড়ি খেতে লাগল। আর অসংখ্য জোনাকির স্রোত ঘরে হাউইবাজির মতো পাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

আমাদের ভীষণ শীত করছিল। ভয়ে আর ঠাণ্ডায় আমরা সকলে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। অন্ধকারে নজর চলছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম, একরাশ কালো ধোঁয়া ঘরের আঁধার থেকে ভেসে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর জোনাকিগুলো যেন এক পৈশাচিক উল্লাসে ঘরের বাতাসে মাতালের মতো নাচছে...নাচছে...নাচছে।

তারই মধ্যে কাকিমার সর্বহারা মর্মান্তিক কান্না আমার কানে আসছিল। আমরা সবাই অসহায়ের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম।

নন্দিনীর রাতের স্বপ্ন

মৃত্যু নিয়ে কথা হচ্ছিল।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে কাছে পেলেই কী করে যেন অলৌকিক অপার্থিব ঘটনার কথা চলে আসে। প্রিয়নাথের বাড়ি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে। এ-পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িই বেশ পুরনো। কোনও-কোনও বাড়ি পলেস্তারা খসে পড়া চেহারার, অথচ দু-মহলা। কোনও বাড়ির দালানে রয়েছে গৃহদেবতার মন্দির, কোনও বাড়ি থেকে কাক-ভোরে শোনা যায় স্তোত্রপাঠ, আবার কোনও বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলি। এসব বাড়ির আনাচে-কানাচে কার্নিশে গোলাপায়রার রমরমা।

এ-ধরনের পুরনো পাড়ায় যেমন রোয়াক-কালচার রয়েছে তেমনই আছে বৈঠকী আড্ডার আসর। সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় এরকমই এক নিয়মিত আসর বসে। সন্ধেবেলার এই আসরে সবরকম বিষয় নিয়েই চর্চা হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ হাজির থাকলেই কেমন এক ঘোরালো-প্যাঁচালো পথে আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেত অশরীরী-অলৌকিকে গিয়ে দাঁড়ায়।

আজ সেই সকাল থেকেই আকাশ মেঘভাসি। তারপর দুপুরবেলা ধারাপাতের প্রথম পাতার শুরু। যতই সময় গড়িয়েছে বৃষ্টির দুঃখ ততই বেড়েছে। তাই হাঁটুজল ঠেলে সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় মাত্র চারজন এসে হাজির হয়েছেন। রাস্তায় জমে থাকা জলের ওপরে খই-ফোটানো ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ পরিবেশটাকে একটু যেন অন্যরকম করে দিয়েছিল।

সুপ্রকাশ পালিতের চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। বেশ কিছুদিন আগে ছানি কাটিয়েছেন। বয়েস যত না হয়েছে তার তুলনায় মুখে ভাঁজ পড়েছে অনেক বেশি। একটু মোটাসোটা জমিদারি চেহারার মানুষ। গাল দুটো ভারি হওয়ায় মুখের দুপাশে সামান্য ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল এখনও পুরোপুরি সাদা হয়ে যায়নি। নাকটা বেশ বড়, সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। নীচের ঠোঁটটা খানিকটা ওলটানো। গায়ের রং মাজা হলেও ঠোঁটের রং অস্বাভাবিকরকম গোলাপী।

হঠাৎই সুপ্রকাশ পালিত মন্তব্য করলেন, 'ভূতনাথকে আজ সরাসরি একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেব।'

প্রিয়নাথ সিগারেটের ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে ছিলেন, হেসে বললেন, 'কী চ্যালেঞ্জ?'

'চ্যালেঞ্জ মানে একটা স্ট্রেট কোশ্চেন করব—তার স্ট্রেটকাট জবাব চাই। যদি


সমীর সরকার

স্পষ্ট জবাব না দিতে পারেন তা হলে ধরে নেব আপনি হেরে গেছেন।'

বরেন মল্লিক পান চিবোচ্ছিলেন। জড়ানো গলায় কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! কী ব্যাপার! ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

বরেন মল্লিকের লন্ড্রি আছে। তাই বর্ষা-ভেজা কাদা প্যাচপেচে দিন খুব পছন্দ করেন। পানের দারুণ ভক্ত। প্রায়ই বলেন, 'পান আর বর্ষা আমার বড় ভরসা। পান নইলে জীবন বৃথা, আর বর্ষা নইলে লন্ড্রির ব্যবসা ঢিলে—ক্যাশ বাক্স ঠনঠন গোপাল।'

বিজন সরকার এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। পাড়ায় সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ছিপছিপে ফরসা চেহারা। পঞ্চাশ ছুঁতে না ছুঁতেই মাথার চুলে মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে। সবসময় হাসিখুশি মেজাজে থাকেন। সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে পাড়ার ব্যাপারেই কী একটা দরকার ছিল বলে এই বৃষ্টি মাথায় করেও এসেছেন। তারপর আড্ডায় জমে গেছেন।

বিজন সরকার হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার, সুপ্রকাশদা! একেবারে খেপে গিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন!'

বৃদ্ধ জগৎ শ্রীমানী হাতের বিড়িতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছিলেন। ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, 'কী স্ট্রেট কোশ্চেন, সুপ্রকাশ? আমার বউ ফুলশয্যার রাতে বিয়ের সময় যে-কোশ্চেন করেছিল সেরকম নয় তো।' ফিকফিক করে হেসে উঠলেন জগৎ শ্রীমানী। হাসির দমক থামলে বিড়িতে জুত করে একটা টান দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য প্রিয়নাথবাবুর ভয় বা লজ্জার কিছু নেই। উনি সাত্ত্বিক ব্যাচিলার মানুষ। তোমার কোশ্চেন যদি নো-বল বা ওয়াইড বল না হয় তা হলে উনি ঠিক স্ট্রেট ব্যাটে খেলে দেবেন।'

জগৎ শ্রীমানী চেহারায় ছোটখাটো। যথেষ্ট বৃদ্ধ মানুষ। আদিরসের রসিকতার জন্য পাড়ায় বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত। ঈশ্বরভক্ত মানুষ অথচ মজা করে বলেন, 'ভগবান আমাকে টেনে নেয় নিক, কিন্তু আমার গোবেচারা বউটাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছে বলুন তো! ভগবানসাহেবের কি বউ নেই!'

জগৎবাবুর স্ত্রী কয়েকবছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন। ভদ্রমহিলা বলতে গেলে মরে গিয়েও বেঁচে রয়েছেন।

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে বললেন, 'করুন আপনার কোশ্চেন।'

'ভূত আছে, না নেই?' গলাখাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জানতে চাইলেন সুপ্রকাশ।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'কী আর বলব! ভূত আছে ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা বলেন ভূত আছে। আর, ভূত নেই ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা

বললেন ভূত-টুত কিছু নেই।'

উত্তর শুনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন সুপ্রকাশ পালিত : 'এ কেমন উত্তর হল, ভূতনাথ। এ তো এড়িয়ে যাওয়া জবাব হল। আমি ভূতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত আছে ভাবলে আমার তো কোনও সুবিধে হয় না!'

প্রিয়নাথ হেরে যাওয়া হাসি হাসলেন। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'ঠিক আছে। একটা স্ট্রেটকাট জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর জগৎ শ্রীমানী চনমনে হয়ে বসলেন।

হঠাৎই বাজ পড়ার শব্দ হল। শব্দের রেশ অনেকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করল মেঘলা আকাশে।

সকলের মুখের ওপরে আলতো করে চোখ বুলিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনারা সকলেই তো একসময় জ্যামিতি পড়েছেন। তাতে বিন্দুর সংজ্ঞা মনে আছে? যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে—তাকেই বলে বিন্দু। কী অদ্ভুত সংজ্ঞা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, অথচ আছে। অর্থাৎ মাপা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। এটাই আপনার স্ট্রেট কোশ্চেনের স্ট্রেটকাট জবাব, সুপ্রকাশদা। ভূত হল জ্যামিতির ওই বিন্দুর মতো। বিজ্ঞান দিয়ে মাপা যায় না, অথচ অস্তিত্ব আছে।'

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। ঘরে অদ্ভুত এক অনুভব নেমে এল যেন।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা বড়সড় তক্তপোশ—সবুজ-কালো চেক কাটা চাদরে ঢাকা। আর একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং-পালিশ সবই মলিন হয়ে গেছে।

ঘরের এক দেওয়ালে একটা অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম-ঘড়ি। তার পাশেই একটা বড় মাপের পুরনো ফটোগ্রাফ। ফটোয় সার বেঁধে অনেকে দাঁড়িয়ে। সময়ের আঁচড়ে ফটোর নানা জায়গায় ক্ষয় ধরেছে, কালো রং বাদামী হয়ে গেছে।

ঘরের ডানদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কারুকাজ করা একটা প্রাচীন আলমারি। আলমারির পাল্লা কাচের। মলিন কাচের ওপিঠে কিছু বইপত্র আর টুকিটাকি জিনিস। একেবারে ওপরের তাকে দুটো পেতলের কাপ—কোনওকালে সুপ্রকাশ পালিতের কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো প্রাইজ পেয়েছিলেন।

পুরনো বিড়ি শেষ করে নতুন একটা বিড়ি ধরালেন জগৎ শ্রীমানী। সস্তা লাইটারটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে-রাখতে মাথা নেড়ে তারিফের সুরে বললেন, 'বেড়ে বলেছেন, প্রিয়নাথবাবু। ভূত নেই, অথচ আছে। কিংবা আছে, অথচ নেই।'

বরেন মল্লিক পানের পিক ফেলতে দরজার কাছে উঠে গেলেন। ফিরে আসতে-আসতে বললেন, 'এ-বৃষ্টি আরও ঘণ্টাখানেক চলবে।' তারপর তক্তপোশে গুছিয়ে বসে মন্তব্য করলেন, 'বোঝা গেল ভূত হচ্ছে বর্ডারলাইন কেস।'

বিজন সরকার মন দিয়ে সকলের কথা শুনছিলেন, আর কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিলেন। সামান্য ফাঁক পেতেই বেশ সিরিয়াস মুখে প্রিয়নাথকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, প্রিয়নাথবাবু, ভূত আর দুঃস্বপ্ন কি একই?'

প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে বিজন সরকারের দিকে তাকালেন। আলো পড়ে তাঁর টাকের একটা দিক চকচক করছিল।

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

'যেহেতু দুটো দেখেই আমরা ভয় পাই। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাই। যদিও জানি ওগুলো স্বপ্ন, মিথ্যে—তা হলেও আমি ভয়ে কুলকুল করে ঘামতে থাকি। এটা কেন হয়?'

'কারণ, স্বপ্ন দেখার সময় আমরা স্বপ্নটাকে সত্যি বলে ভাবি। ওটা যে স্বপ্ন, সেটা বুঝতে পারি ঘুম ভেঙে সচেতন হওয়ার পর। তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্নটা আমাদের মনে থাকে না। অনেকসময় টুকরো-টুকরো মনে থাকে। গোটা স্বপ্নটা মনে রাখতে পারে এমন মানুষ খুবই কম। কোনও-কোনও স্বপ্ন কোন এক অজানা কারণে মনে থেকে যায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর দেখা একটা স্বপ্ন সাঁইতিরিশ বছর পরেও স্পষ্ট মনে রাখতে পেরেছিলেন। এটা খুবই রেয়ার ক্যাপাসিটি। এর ব্যাখ্যা কেউ এখনও দিতে পারেননি। তা ছাড়া, স্বপ্ন যে আমরা ভুলে যাই তার ব্যাখ্যাও বেশ জটিল।'

সুপ্রকাশ পালিত বিড়বিড় করে বললেন, 'ভূতের মতোই...স্বপ্নও বড় রহস্যময় ব্যাপার। মৃত মানুষরা স্বপ্নেও অনেক সময় দেখা দেয়। আমার এক খুড়তুতো ভাই আটাশ বছর আগে বাস চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। আমি তখন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ওকে শেষ-দেখা দেখতে পারিনি। অথচ ওর অ্যাকসিডেন্ট হওয়া ডেডবডিটা আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতে পাই। আমি ওকে খুব ভালোবাসতাম।'

বৃষ্টি হঠাৎ জোরে শুরু হল। বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল আবার।

প্রিয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তা হলে একটি মেয়ের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার গল্প আপনাদের শোনাই। মেয়েটি বারবার করে বলেছিল, তার অসুখের কথা আমি যেন কাউকে না বলি। তাই ওর আসল নাম আপনাদের বলছি না। ও আমার কাছে ওর অসুখের ব্যাপারে কনসাল্ট করতে এসেছিল। আমি ওকে কয়েকটা সাজেশন দিয়েছি। তাতে কিছু-কিছু কাজও হয়েছে।' চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন প্রিয়নাথ : 'তবে গল্পটা বলার পর কেউ আমাকে কোনও

প্রশ্ন করতে পারবেন না। সুপ্রকাশদা, আপনিও যেন আবার নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন না।'

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

'ধরা যাক, মেয়েটির নাম নন্দিনী...।'

ঘরের তেরছা আলোয় নন্দিনীর মুখে ভয়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ও অসহায় চড়ুইপাখির চোখে ডক্টর মল্লিকের চোখে তাকিয়ে রইল। অনেক আশা নিয়ে ও ডক্টর মল্লিকের চেম্বারে এসেছে। মনের চিকিৎসার ব্যাপারে ওঁর খুব নাম। অফিসের এক কোলিগের কাছে নন্দিনী ডক্টর সুনয়ন মল্লিকের খোঁজ পেয়েছে।

ডক্টর মল্লিকের কপালে অসংখ্য ভাঁজ—ভাঁজের সংখ্যা কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ ছোট করে তিনি সাতাশ-আটাশের সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকালেন। একটা ছোট্ট 'হুম' শব্দ করে ভারি গলায় বললেন, 'রক্তের দাগ? আপনি শিওর?'

নন্দিনী আমতা-আমতা করে বলল, 'আমার তো সেরকমই মনে হয়েছে। আপনি হয়তো দেখলে বলতে পারবেন—।'

ডক্টর মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। তারপর পেশাদারি সুরে বললেন, 'এইভাবে বললে ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না। কেমন যেন এলোমেলো...খাপছাড়া শোনাচ্ছে। আপনি বরং একটু গুছিয়ে বলুন...।'

নন্দিনী চেয়ারে একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল। তাঁতের শাড়ির আঁচলটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে ঠিকঠাক করে নিতে চাইল। তারপর বারকয়েক ঢোক গিলে মিষ্টি গলায় বলল, 'ঠিক আছে, প্রথম থেকে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি...।'

নন্দিনী প্রায় প্রত্যেক রাতে একটা ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নটা সত্যি-সত্যি ভয়ের কি না ও জানে না, তবে স্বপ্নটা দেখে ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। একই ভয়ের স্বপ্ন রোজ দেখতে-দেখতে ভয়ের মাত্রা ক্রমশ কমে আসা উচিত, কিন্তু ওর বেলায় সেটা হয়নি। বরং উলটে ওর ভয় বেড়ে গেছে।

'ডাক্তারবাবু, প্রায় এক বছর ধরে আমি একটা স্বপ্ন দেখি—একই স্বপ্ন—কিন্তু ওটা দেখলেই আমি ভয়ে পাথর হয়ে যাই—।'

ডক্টর মল্লিক লাইটার জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠাট্টার মেজাজে বললেন, 'আপনার মুখ-চোখ দেখছি শুকিয়ে গেছে! স্বপ্নটা আমাকে বলতে গেলেও কি আপনার ভয় করবে না কি! নিন, চটপট শুরু করুন...।'

'সল্টলেকের আট নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে একটা ছোট বাড়িতে আমরা থাকি। আমরা মানে, আমি আর আমার মা। মায়ের অনেক বয়েস হয়েছে...নানান রোগে একেবারে

শয্যাশায়ী। আমার বাবা মারা গেছেন প্রায় আট বছর আগে। মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তারপর থেকে ওই বাড়িতে শুধু আমরা দুজন। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করি। সেই সময়টা একজন আয়া মায়ের দেখাশোনা করে। মায়ের ঘর দোতলায়, আর আমারটা একতলায়। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে এরকমভাবে শুতে হয়। তবে মায়ের ঘর থেকে আমার ঘরে কলিংবেলের ব্যবস্থা আছে—যদি কোনওরকম ইমার্জেন্সি হয়, তাই। মা রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। ফলে রাতে কখনও জাগেন না। এতে আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি।

'রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে-শুতে আমার প্রায় এগারোটা মতন হয়। তারপর একটু গল্পের বই-টই পড়ি। মোটামুটি আধঘণ্টা বই-ম্যাগাজিন পড়ার পর ঘুম। আর ঘুমোলে পরই আমি স্বপ্নটা দেখতে শুরু করি।'

কথা বলতে-বলতে নন্দিনীর গলার স্বর কেমন যেন ফিসফিসে হয়ে যাচ্ছিল। ওর ফরসা মুখে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডক্টর মল্লিকের ভীষণ মায়া হচ্ছিল। সিগারেটে তৃপ্তির টান দিয়ে তিনি মমতা মাখানো গলায় নন্দিনীকে তাড়া দিলেন : 'থামলেন কেন, বলুন—।'

'হ্যাঁ, বলছি—।' একবার ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করল নন্দিনী, 'আমার ঘরের একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের প্যাঁচা আছে। খুব দুষ্প্রাপ্য কোনও কিউরিয়ো নয়—নেহাতই সাধারণ জিনিস। অনেক আগে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে বাপি—মানে, আমার বাবা—ঘর সাজানোর জন্যে ওটা নিয়ে এসেছিলেন। আমার স্বপ্নটা শুরু হয় ওই প্যাঁচাটা দিয়ে—তবে ওটা তখন আর কাঠের প্যাঁচা থাকে না।

'স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎই আমি দেখতে পাই ওই প্যাঁচাটা সবুজ রঙের বরফের চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ওর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই আমি। কখনও-কখনও ওটা মুখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকায়। তারপর আবার রক্ত-হিম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তখন আমার ভীষণ শীত করতে থাকে। ঠাণ্ডায় শরীরে কাঁটা দেয়, বুকের ভেতরটা আকুল হয়ে কাঁপতে থাকে। আর সেই সময়েই শুরু হয়ে যায় শিসের শব্দ। সুরেলা শিস দিয়ে কেউ যেন আমাকে ডাকছে—অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

'আমার বিছানার মাথার দিকে একটা জানলা আছে। তবে বারোমাসই ওটা আমি বন্ধ করে শুই। কিন্তু স্বপ্নের ভেতরে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, ওটা কে যেন খুলে দিয়েছে, আর খোলা জানলা দিয়ে হিম-বাতাস কুলকুল করে ঢুকে পড়ছে

ঘরে।

'ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার খাটের নীচে কেউ যেন লুকিয়ে রয়েছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অলৌকিক এক ক্ষমতায় ব্যাপারটা আমি টের পেলাম। আর একইসঙ্গে একটা দুর্গন্ধের ঢেউ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। সাগরে যখন ঘূর্ণিঝড় ওঠে তখন কখনও-কখনও জলস্তম্ভ তৈরি হয়ে যায়। সেই জলস্তম্ভ যখন সাগরের বুকে আছড়ে পড়ে তখন তার ঝাপটায় অনেক সময় বড়সড় জাহাজও তলিয়ে যায়। এই দুর্গন্ধের ঝাপটা যেন তার চেয়েও কিছু বেশি। আমি একেবারে তলিয়ে গেলাম। আমার ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা পলকে অসাড় হয়ে গেল।

'বিছানা থেকে না নেমেই আমি বিছানার চারপাশটা দেখতে পেলাম...।'

নন্দিনী দম নেওয়ার জন্য একটু থামল। খসখসে গলায় বলল, 'একটু...একটু জল দেবেন?'

ডক্টর মল্লিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তিনি টেবিলে রাখা একটা জলের জাগ এগিয়ে দিলেন নন্দিনীর দিকে। ঢকঢক করে জল খেল নন্দিনী। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নিল। তারপর আবার শুরু করল ওর স্বপ্নের গল্প।

'...দেখলাম, আমার বিছানার চাদরটা নাটকের ড্রপসিনের মতো মেঝের দিকে অনেকটা করে ঝুলে রয়েছে। আর কোন এক অলৌকিক হাওয়ায় চাদরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চাদরের পেছনে কিছু একটা নড়ছিল। এও বুঝতে পারছিলাম, দুর্গন্ধের দমকা ঢেউটা বিছানার নীচ থেকেই বেরিয়ে আসছে। তা হলে কি দুর্গন্ধ ছড়ানো কোনও প্রাণী ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে! তখনই দেখলাম, চাদরের গায়ে রক্তের দাগ!

'বিছানায় শুয়ে-শুয়েই আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, টের পাচ্ছিলাম। আর ভয়ে সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিলাম। ওই শিসের শব্দ, প্যাঁচার ডানা ঝাপটানি, আর ওই গন্ধ আমাকে ধীরে-ধীরে পালটে দিচ্ছিল। তার ওপর ওই রক্তের দাগ...।

'হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমার সারা গা লোমশ হয়ে উঠছে, দাঁতগুলো ঠোঁটের আড়ালে আর থাকতে চাইছে না। একইসঙ্গে আমার হাত আর পায়ের নখ কালচে লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল। আর আমি পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে বিছানাটাকে দাঁতে নখে চিরে ফালাফালা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম।

'অন্ধকারেই আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু দূরে রাখা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে হঠাৎই নজর পড়েছিল আমার। দেখি, সেখানে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। কিন্তু এ কার মুখ! সারাটা মুখ ওই প্যাঁচাটার চোখের মতো গাঢ় সবুজ, গাল দুটো বসা, চোখের জায়গায় দুটো অন্ধকার গর্ত। ঠিক তখনই একটা হিংস্র গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম আমি। তারপর আর ভালো করে

কিছু মনে নেই...।'

স্বপ্ন শেষ করে নন্দিনী থামল। ছোট রুমাল মুখে বুলিয়ে ঘাম মুছে নিতে চাইল।

ডক্টর মল্লিক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথায় আলতো করে হাত চালিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্বপ্নটা দেখে আপনার খুব ভয় করে নিশ্চয়ই?'

নন্দিনী শুকনো গলায় বলল, 'হ্যাঁ—।'

'স্বপ্নের ঠিক কোন জায়গাটা আপনার কাছে সবচেয়ে ভয়ের বলে মনে হয়?'

একটু ইতস্তত করে নন্দিনী বলল, 'বলব? শুনলে আপনি হাসবেন না তো!'

'আরে না, না—আপনি নির্ভয়ে বলুন। আই অ্যাম ড্যাম সিরিয়াস।'

'স্বপ্নের কোনও বিশেষ জায়গা নয়—গোটা স্বপ্নটাই আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত আর সত্যি বলে মনে হয়—এটাই সবচেয়ে ভয়ের, ডাক্তারবাবু।'

ডক্টর মল্লিক হঠাৎই হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে তাঁর ভারি শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'মিস রয়, আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নানা ধরনের অবসেশন থেকে, মনের চাহিদা থেকে। অনেক সময় ছোটবেলার কোনও ঘটনার জন্যে অপরাধবোধ বহু বছর পর্যন্ত স্বপ্নের ভেতরে তাড়া করে ফিরে বেড়ায়।' ডক্টর মল্লিকের কপালে ভাঁজ পড়ল। গলার স্বর নামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'ছোটবেলায় আপনার সঙ্গে কোনও বাজে ব্যাপার হয়েছিল?'

'বাজে ব্যাপার মানে?' নন্দিনীর মুখে সরল বিস্ময় ফুটে উঠল।

'মানে, ইয়ে, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কোনও ব্যাপার...।'

'ন্-না, সেরকম কিছু হয়নি।'

'তা হলে আপনার চিন্তার কিস্যু নেই। হয়তো কোনও আজগুবি ভয়ের গল্প পড়ে আপনার স্বপ্নে তার ছায়া পড়েছে। আপনি স্বপ্নটাকে কোনও গুরুত্ব দেবেন না। দেখবেন, ধীরে-ধীরে আপনার স্বপ্নটা ঝাপসা হয়ে এসেছে।'

ডক্টর মল্লিকের আশ্বাসে নন্দিনী বোধহয় তেমন ভরসা পেল না। আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি গল্পের বই পড়ি বটে, তবে এই স্বপ্নটার মতো ঘটনা কোনও বইয়ে পড়িনি। আমার স্বপ্নটা ভীষণ জীবন্ত, আর সত্যি...।'

'ওটা আপনার কল্পনা, মিস রয়। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না—স্বপ্ন স্বপ্নই। আমরা যখন জেগে থাকি তখন নানান ঘটনায় অংশ নিই—তারই ছাপ কখনও-কখনও স্বপ্নে দেখা যায়। তার বেশি কিছু নয়। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান। টিভি-তে একটু সিনেমা-টিনেমা দেখুন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারুন, প্রেম করুন, মায়ের সঙ্গে গল্প করুন—লিড আ নরমাল লাইফ। তা হলেই দেখবেন

সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে গেছে। আমার কাছে আর আসতে হবে না। আপনি আমাকে ওয়ান ফিফ্‌টি দেবেন।'

ডক্টর মল্লিক একটানা সুরে এমনভাবে শেষ কথাটা বললেন যে, নন্দিনী প্রথমটা বুঝতে পারেনি উনি ভিজিটের কথা বলছেন। তারপরই মাথা নিচু করে ব্যস্তসমস্তভাবে ব্যাগ হাতড়ে ভিজিটের টাকাটা বের করল, ডক্টর মল্লিকের হাতে দিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নন্দিনী, আলতো সুরে বলল, 'আপনি বলছেন, সত্যিকারের সব ঘটনার ছায়া স্বপ্নে দেখা যায়। এর উলটোটা কি হয় না? মানে, স্বপ্নের ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে না? বিশ্বাস করুন, আমার স্বপ্নটা এত জীবন্ত...।'

'ডোন্ট টক রাবিশ, মিস রয়!' নন্দিনীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডক্টর মল্লিক, 'সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। বললাম তো, আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান—।'

নন্দিনী হাসল—কেমন যেন অস্বাভাবিক হাসি। তারপর মিষ্টি করে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করছেন না তো! আমার স্বপ্নটা তা হলে আপনাকে দেখাই...।'

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ ঘরের ভেতরে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

নন্দিনীর চোখে এক অলৌকিক আলো জ্বলে উঠল। ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। একইসঙ্গে ঘরের উষ্ণতা কমতে-কমতে বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেল। বিচিত্র এক হিম-বাতাস ঘরের ভেতরে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল এক সুরেলা শিসের শব্দ।

হঠাৎই একটা বিকট দুর্গন্ধের ঢেউ ডক্টর মল্লিকের চেতনা অসাড় করে দিল। একটা অদৃশ্য পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। আর অন্ধকারেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সুন্দরী মেয়েটির কমনীয় হাত দুটো লোমশ হয়ে উঠছে, হাত আর পায়ের নখ মাপে বড় হয়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গেছে, গাল দুটো বসে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে, চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত—আর তারই মাঝে দুটো সবুজ আলোর বিন্দু।

নন্দিনীর মুখের রং ক্রমেই গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে, দাঁতের দিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছে না।

ডক্টর সুনয়ন মল্লিক আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। বুঝতে পারলেন, তিনি শেষের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন।

ভয়ঙ্কর কর্কশ পুরুষালী গলায় নন্দিনী বলে উঠল, 'এবার আমার স্বপ্নটা বিশ্বাস হল তো!'

অলক্ষণের গণ্ডি

লক্ষ্মণের গণ্ডির কথা তো আপনারা সবাই জানেন। ওই গণ্ডির বাইরেই ওত পেতে ছিল যত বিপদ। কিন্তু আমি এখন আপনাদের শোনাতে বসেছি অলক্ষণের গণ্ডির কথা—যে-গণ্ডির ভেতরে অজানা এক বিপদ প্রায় একশো বছর ধরে অষ্টপ্রহর ওত পেতে রয়েছে।

ঘটনাটা আমাকে শুনিয়েছিল প্রায় পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ একজন খাসিয়া উপজাতির মানুষ। ওর নাম ছিল পহেলা। জাটিঙ্গা গ্রামে ও জন্ম থেকেই আছে।

অসমের নর্থ কাছাড় হিল্‌স জেলার একটি গ্রাম জাটিঙ্গা। গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান 25°12′N 93°E। তার অধিবাসী খাসিয়া উপজাতির মাত্র হাজারদেড়েক মানুষ।

১৯০৫ সালে হাফলঙ নগরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্বে জাটিঙ্গা গ্রামের পত্তন হয়েছিল। জায়গাটির 'অভিশপ্ত' বলে বদনাম ছিল। ইউ. লাখোনবঙ সুচ্যাঙ নামের একজন খাসিয়া সেখানকার আদি অধিবাসী জেমি নাগাদের কাছ থেকে নামমাত্র দামে 'অভিশপ্ত' গ্রামটিকে কিনে নেন। তখন পহেলার বয়েস ছিল মাত্র তিন বছর।

তার টিনের চালের বাড়ির দাওয়ায় বসে নেশাগ্রস্ত পহেলা আমাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিল। সন্দেহ নেই, প্রথমে কাহিনীটি আমার কাছে আপাদমস্তক আজগুবি বলে মনে হয়েছিল। তা ছাড়া পূর্ণিমার চাঁদের আলো, ঠাণ্ডা বাতাস, আর পহেলার জরাজীর্ণ আঁকিবুকি কাটা মুখ সবকিছুর ওপরে একটা অলৌকিক মাত্রা চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গল্পের শেষে এমন প্রমাণ পহেলা দাখিল করেছিল যে, আমি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম—ওর কথা সেই মুহূর্তেই আগাগোড়া বিশ্বাস করেছিলাম আমি। খুব সাধ জেগেছিল, পহেলার বর্ণনা মতো অলক্ষণের গণ্ডি ঘেরা জায়গাটা একবার দেখে আসব। কিন্তু একটা পরিচয়হীন ভয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছিল। বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠেছিল, যেয়ো না!—তা হলে আর কোনওদিনই তুমি ফিরতে পারবে না।

পহেলাও সে-কথা বলেছিল—ওই অলক্ষুণে জায়গা থেকে কেউ কখনও ফিরে আসেনি। শুধু পহেলা নেহাতই ভাগ্যের জোরে ফিরে এসেছিল—ভয়ঙ্কর এক প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে।


সমীর সরকার

ও জগাখিচুড়ি ভাষায় জড়ানো গলায় যে-গল্প সেদিন শুনিয়েছিল সেটাই সহজ করে আপনাদের বলছি। তবে আগেই বলে রাখছি, এ-কাহিনী যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে আমি অন্তত কোনও অভিযোগ করব না।

পহেলা আমাকে বলেছিল...।

স্যার, আপনাকে তো আগেই বলেছি, জাটিঙ্গার পাহাড়ে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানোটা আমার নেশা। সেই কোন যুগে জার্মানির একটা দোনলা শটগান বাবার কাছ থেকে হাতে পেয়েছিলাম। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে আমি সবসময় শিকারে বেরোতাম।

জাটিঙ্গার জঙ্গলে বেশিরভাগই মুলি বাঁশের ঝাড় আর বেতগাছের রমরমা। আপনি খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আমাদের গ্রাম থেকে হাফলঙের দিকে দু-কিলোমিটার এগোলে ডানদিকের খাদে খুব ঘন জঙ্গল দেখতে পাবেন। ওই জঙ্গলে কেউ যায় না। মানে, আমি যাওয়ার পর থেকে আর কেউ যায়নি। আমার আগে ডাকাবুকো খাসিয়া যুবকরা কেউ-কেউ হয়তো গিয়ে থাকবে, কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। আমিই একমাত্র মানুষ, যে ফিরে এসে আর সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি। জানিয়ে দিয়েছি, ওখানে গেলে কী হতে পারে।

পিচের রাস্তা থেকে যদি আপনি ঢাল বেয়ে নামেন তা হলে, স্যার, দেখতে পাবেন ওখানে একটা 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগানো রয়েছে। আর লেখার নীচে একটা মড়ার খুলি আঁকা আছে। তবে এসব করা হয়েছে অনেক পরে।

আপনি তো জানেন, আমাদের চাষবাস বলতে 'জুম'-এ গিয়ে আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, আনারস এসবের চাষ। জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে চাষের জমিতে যাতায়াতের পথে অনেক সময় দাঁতালো শুয়োরের মুখোমুখি হতে হয়। তখন চার্লস ডেলি মডেলের শটগানটা আমার কাজে লাগে। একদিন সন্ধের মুখে 'জুম' থেকে ফেরার সময় এক প্রকাণ্ড মাপের দাঁতালো শুয়োরের মুখোমুখি হলাম। দু-দুটো গুলি ছুড়লাম বটে, কিন্তু ওটাকে সেরকমভাবে ঘায়েল করতে পারলাম না। তখন আমি শূন্য শটগান হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলাম। কিন্তু ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেভাবে দৌড়নো অসম্ভব। আমি কোনওরকমে ঝোপঝাড় ঠেলে পথ তৈরি করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ডালপালা-পাতার আওয়াজ ছাপিয়ে আহত শুয়োরটার গজরানি বেশ কানে আসছিল।

অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

শটগানের নল দিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে আমি এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা গুঞ্জনের শব্দ আমার কানে এল। সন্ধে হলে জাটিঙ্গাতে ঝিঁঝির ডাকে কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু এটা সেই শব্দ নয়—তার চেয়ে আলাদা। ঝিঁঝির ডাক থাকা সত্ত্বেও ওই মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আলাদা করে বেশ কানে আসছিল।

দাঁতালো শুয়োরটা বোধহয় একগুঁয়েভাবে বনবাদাড় ভেদ করে ছুটছিল। কারণ আমি গাছপালার এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, আর শুনতে পাচ্ছিলাম আহত প্রাণীটার গর্জন।

বলতে গেলে আচ্ছন্নের মতোই আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই দেখি খানিকটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা মাঠের মতো। কুয়াশা-মাখা ঘোলাটে আবছা অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ছোট-ছোট কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া জায়গাটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা। যেন কেউ মালী লাগিয়ে জায়গাটা সাফ করিয়েছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গুঞ্জনটা এখন তীব্রভাবে শোনা যাচ্ছিল। যেন কোনও বদরাগী ভিমরুল আমাকে লক্ষ্য করে তীরের মতো ছুটে আসছে—আর তার ডানার শব্দ এসে আমার কানে বিঁধছে। একইসঙ্গে একটা অচেনা কটু গন্ধ আমার নাকে এসে ধাক্কা মারল।

এমন সময় কোনও ছুটন্ত প্রাণীর শব্দ শুনতে পেলাম।

চমকে মুখ ফিরিয়েই দেখি গাঢ় কালো আঁধারের মতো শুয়োরটা ঝোপঝাড় ঠেলে ছিটকে ঢুকে পড়েছে সেই ফাঁকা জায়গায়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে গেল সেই অদ্ভুত ঘটনা।

শুয়োরটা ফাঁকা জায়গাটায় ঢোকামাত্রই গোড়া কাটা কলাগাছের মতো কাত হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। আর কোনও নড়াচড়া করল না, কোনওরকম চিৎকার করল না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। টের পেলাম, আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। একটু আগে উঁকি মারা ভয়টা একলাফে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল। হঠাৎই আমার শরীরের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সেই ঠান্ডার স্রোত পা বেয়ে নামতে লাগল মাটিতে।

আমি হয়তো পড়ে যাওয়া শুয়োরটার কাছে এগিয়ে যেতাম, যদি না সেই মুহূর্তে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেতাম।

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন একটা রাতপাখি ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে চমকে উঠে মুখ তুলতেই দুটো বাদুড় আমার চোখে পড়ল। সীসের মতো আকাশের পটভূমিতে ওদের দেখতে পেলাম আমি। অন্ধকারে আরও অন্ধকার ডানা

মেলে দিয়ে ওরা নিঃশব্দে নিপুণ ছন্দে ভেসে চলেছে।

উড়তে-উড়তে ফাঁকা জায়গাটার ওপরে আসামাত্রই বাদুড় দুটো গাছ-পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে পড়ে গেল নীচে। ওদের দেহ দুটো আছড়ে পড়ার ভোঁতা শব্দ হল। আর সেই মুহূর্তে আমার চিন্তাভাবনাও যেন অবশ হয়ে গেল।

অন্ধকার মাঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না—শুধু সেই গুঞ্জনের শব্দটা ছাড়া।

আমি ক্লান্ত দেহে জঙ্গলের গাছ-পাতার মধ্যেই বসে পড়লাম। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ওঠায় আমার চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে যাচ্ছিল। সামনের ফাঁকা জমিটা ঘিরে একটা মারাত্মক ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল। গাঁয়ের নানা লোকের নানা কথা আমার মনে পড়ল। এটাই তা হলে সেই অভিশপ্ত জায়গা! এটার সঠিক পরিচয় কেউ জানত না বলে এটাকে সবাই জঙ্গল বলে ভেবেছে। যারা এই অভিশপ্ত জায়গাটা চোখে দেখেছে তারা কেউ ফিরে যায়নি—ফিরতে পারেনি। তাই 'অভিশপ্ত জঙ্গল' হিসেবেই গড়ে উঠেছে জাটিঙ্গার কিংবদন্তী।

আমার হাতে অস্ত্র বলতে একটা খালি রাইফেল। আর সারা শরীর পাকে-পাকে জড়িয়ে এক অজানা ভয়। সব মিলিয়ে নড়াচড়ার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই কাছাকাছি একটা বড় গাছ খুঁজে নিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। অন্ধকারে বোধহয় পিঁপড়ের বাসায় হাত দিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাৎই হাতে-পায়ে জ্বালা-ধরানো কামড় টের পেলাম।

কোনওরকমে গাছে উঠে হাত-পা ঘষে পিঁপড়েগুলো ছাড়ালাম। ঝিঁঝিঁপোকার ডাকে কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে আলাদাভাবে মিহি গুঞ্জনটা শোনা যাচ্ছিল। গাছের ওপর থেকে ফাঁকা জায়গাটা চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। একইসঙ্গে লক্ষ করলাম, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে—অর্থাৎ, মাউন্ট হেম্পিয়োর দিক থেকে তরল কুয়াশার স্রোত সাপের মতো ধীরে-ধীরে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে জাটিঙ্গার খাদের দিকে। একটু পরেই হয়তো দুধের মতো সাদা কুয়াশা সামনের ফাঁকা জায়গাটাকে একেবারে ঢেকে ফেলবে।

খিদেয় শরীর আনচান করলেও কোনও উপায় ছিল না। আমি হতভাগ্য শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর কথা ভাবছিলাম। ওই জায়গাটায় কী এমন অভিশাপ আছে যে, কোনও প্রাণী সেখানে ঢুকলেই সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়! আমি যদি ওখানে যাই তা হলে আমারও কি একই দশা হবে!

মনে-মনে ঠিক করলাম, যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরি তা হলে সবার আগে গাঁয়ের হেডম্যানকে ব্যাপারটা জানাব। সে-ই গাঁয়ের লোককে সতর্ক করার ব্যবস্থা করবে।

রোববার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধেবেলা জাটিঙ্গার গির্জায় গাঁয়ের লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে আসে। হেডম্যান যদি বুদ্ধি করে উপাসনার পর চার্চ থেকেই এই বিপদের কথা ঘোষণা করে দেয় তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। খবরটা ছোট্ট গ্রামে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

কুয়াশা ক্রমশ চারপাশ ঢেকে ফেলছিল। ফলে চাঁদের আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে সমানভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক যেন ঘষা কাচ দিয়ে কেউ চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে।

এরই মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। জাটিঙ্গায় এরকম বৃষ্টি প্রায়ই হয়। যেমন হঠাৎ করে তার শুরু, তেমনই হঠাৎ করে তার শেষ।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া জলে আমি ভিজতে লাগলাম। ঠাণ্ডায় শরীরটা কুঁকড়ে যেতে চাইছিল। অসহায়ভাবে আমি দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর মাঝে-মাঝে ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটার দিকে নজর চলে যাচ্ছিল।

নিজের অজান্তেই কখন যেন সামান্য তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল। হঠাৎই কী একটা শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল। চমকে সজাগ হয়ে দেখি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনও পড়ছে। তবে কুয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

একটা অদ্ভুত গোলাপী আভা সামনের খোলা জমিটা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর মিহি গুঞ্জনটা কেমন যেন বিচিত্র সুরে ওঠা-নামা করছে।

এরকম আলো আমি কখনও দেখিনি। এরকম মায়া-জড়ানো সুরও কখনও শুনিনি আমি। আমার ঘুম পেয়ে গেল—না, স্বাভাবিক কোনও ঘুম নয়, নেশায় পাওয়া ঘুম। ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ছেয়ে গেল, চোখ জড়িয়ে গেল অলৌকিক কোনও টানে। প্রাণপণে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে আমি সম্মোহিতের মতো সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইলাম।

গোলাপী আভা ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। আর তখনই নজরে পড়ল, তার মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত কালো ছায়া চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

ছায়াগুলোর অবয়ব যেন 'নিরাকার'—ওদের নির্দিষ্ট কোনও আকার ছিল না। অথচ ওরা গোলাপী কুয়াশার মধ্যে অনায়াস দ্রুতগতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎই আমার শীত-শীত ভাবটা কমতে লাগল। আর তার একটু পরেই বেশ গরম ভাব টের পেলাম। যেন সময় ভুল করে গ্রীষ্মকাল আবার ফিরে এসেছে।

পরিবেশের উষ্ণতা বাড়তে-বাড়তে অসহ্য মাত্রায় পৌঁছে গেল। অলৌকিক এক তাপে আমার মুখ-চোখ যেন পুড়ে যেতে চাইল। আমার মাথাটা কেমন

টলে উঠল। চারপাশের গাছপালা দুলে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। আমার হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ে গেল নীচে।

কোনওরকমে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, একটা দ্যুতিময় গোলাপী বল কুয়াশার ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে উড়ে চলেছে শূন্যে। কী অদ্ভুত মাতাল করা আভিজাত্যে ভরা তার মসৃণ গতি!

আর আমার কিছু মনে নেই, কারণ তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম নীচে।

কাক-ভোরে আমার ঘুম ভাঙল—যদিও, স্যার, এখানে কাক, শালিক বা চড়ুই দেখতে পাওয়া যায় না। হাফলঙে যে-দু-একটা কাকের দেখা মেলে সেগুলো দাঁড়কাক।

ঘুম ভেঙে যা দেখলাম সে বোধহয় রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

জল-কাদা মাখা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি টলতে-টলতে ফাঁকা জমিটার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জমির এলাকায় হয়তো ঢুকেই পড়তাম, যদি না সেই মুহূর্তে দুটো প্রকাণ্ড বড় মাপের প্রজাপতি জমির এলাকায় ঢুকেই টুপ করে খসে পড়ত।

হেলে থাকা একটা সরু বাঁশগাছ ধরে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গতকাল সন্ধের আবছা আলোয় যা-যা চোখে পড়েনি এখন সেগুলো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল।

মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো ফাঁকা জমিটায় যেসব আগাছা গজিয়েছিল সেগুলো সব পুড়ে কালো হয়ে গেছে। নানা ধরনের কঙ্কালে জায়গাটা ভরতি। জমিটার ডানদিক ঘেঁষে একটা লম্বা ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে সাদা ধোঁয়ার রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে। জমিটার বাঁদিকে একটা বড় মাপের পোড়া গাছ। তার একটা পোড়া ডাল থেকে একটা নাম-না-জানা পাখির কঙ্কাল ঝুলছে।

সবকিছু দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠল। কাল রাতের কটু গন্ধটা বেশ কয়েক গুণ হয়ে যেন একেবারে মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মারল। এ আমি কোন অলৌকিক শ্মশানের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি! কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায় এখানে দিনের পর দিন ধরে শুধু হাড় জমা হয়েছে! কোথায় গেল কাল রাতের শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর দেহ? ওগুলো কি মুহূর্তে কঙ্কালের চেহারা নিয়েছে? কোথায় উড়ে গেল ওই গোলাপী গোলক? অবয়বহীন কালো ছায়াগুলোই বা গেল কোথায়? ওরা কারা? ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

আমার ক্লান্ত অবসন্ন মনের মধ্যে এইসব প্রশ্ন উথালপাথাল করছিল, অথচ কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মাতালের মতো টালমাটাল পায়ে পেছনের জঙ্গলের ঘাস-পাতা-কাদা ঘেঁটে দোনলা বন্দুকটা খুঁজে বের করলাম। ওটা তুলে নিয়ে জঙ্গল হাঁটকে ফেরার পথের হদিস করতে চাইলাম।

ঠিক তখনই একটা প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার পাখি—যাকে চলতি কথায় আপনারা দুধরাজ বলেন—আমার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল ওই অভিশপ্ত জায়গাটার দিকে। আর তার এলাকায় ঢুকে পড়ামাত্রই ব্যস—অমন সুন্দর ধবধবে পাখিটা খতম।

কী যে হল আমার, দৌড়ে ফিরে গেলাম ওই ফাঁকা জমিটার সীমানায়। দেখি সীমানার কাছাকাছিই পড়ে রয়েছে পাখিটা। তার লম্বা বাঁকানো লেজ একেবারে স্থির। ডানার একটি পালকও আর নড়ছে না।

হঠাৎই আমার চোখের সামনে যেন ম্যাজিক শুরু হল। পাখিটার নরম পালক আর শরীর তিলতিল করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। জমির মাটির সঙ্গে আগাছার সঙ্গে তার পালক আর শরীরের কণা যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে গেল।

হা ভগবান! একটু পরেই পড়ে রইল শুধু পাখিটার কঙ্কাল। যেন ভাগ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয়ে শুধু ভাগশেষ পড়ে আছে।

চোখের সামনে এ-দৃশ্য দেখে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম, স্যার। দাঁতালো শুয়োরের মতো রাগ হয়ে গেল শরীরে। জানোয়ারের মতো চিৎকার করে জমিটাকে খিস্তিখেউড় করে উঠলাম আমি। শটগানসমেত ডানহাত ছুড়ে দিলাম সামনে।

রাগে বোধহয় আমার আন্দাজে ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। বোধহয় আমার হাতটা ঢুকে পড়েছিল জমিটার এলাকায়। কারণ চোখের পলকে আমার হাতে ধরা অবস্থাতেই বন্দুকটা গরম হয়ে গেল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে হাত টেনে নিলাম। আমার হাত অসহ্যরকম জ্বালা করছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

ওই অবস্থাতেই দেখলাম, বন্দুকটার কাঠের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল— পড়ে রইল তার ইস্পাতের কঙ্কাল।

আর আমার সাহসে কুলোয়নি, স্যার। বাঘে তাড়া করা ছাগলছানার মতো ভয়ে পাগল হয়ে জঙ্গলের মধ্যে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করলাম। কী করে যে সেদিন গাঁয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম জানি না।

গাঁয়ে ফিরে হেডম্যানকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। তারপর গাঁয়ের সবাই ব্যাপারটা জানতে পারে। তখন ওই জঙ্গলটাকে ঘিরে ওইসব 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগানো হয়েছে। আর জাটিঙ্গার সব ছেলেমেয়েই বংশপরম্পরায় ওই

জায়গাটাকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে। ওই জায়গাটা, স্যার, অভিশাপের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কী অভিশাপ সেটা কেউ জানে না—আমিও সেদিন বুঝতে পারিনি।

ওর কাহিনী শেষ করে পহেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা ময়লা সূতীর চাদর ওর গায়ে জড়ানো ছিল, সেটাকে আঁকড়ে ধরে শরীরের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইল। তারপর চিবুক সামান্য তুলে আমার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল। যেন ওর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমার কিছু একটা বলা উচিত।

অন্ধকার পহেলাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছিল। তবু তারই মধ্যে ওর চোখ চকচক করছিল।

কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। ঝিঁঝিপোকার দল মুহূর্তের জন্যে ওদের চিৎকার থামিয়ে আবার একঘেয়ে সুরে কান্না শুরু করল। সিগারেটের ধোঁয়ার মতো কুয়াশার রেখা পুবদিক থেকে ভেসে আসছিল। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কোনও পাহাড়ী মেয়ে বাতাসে ওড়না ভাসিয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আর কোনও উপায় না দেখে আমি ইতস্তত করে বললাম, 'পহেলা, সেদিন তুমি...ইয়ে...আজকের মতো নেশা করে ছিলে না তো!'

একটা হেঁচকি তুলল পহেলা। তারপর নেশা-ধরা গলায় হো-হো করে হেসে উঠল। ওর হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা তিক্ত আক্ষেপ আর বিদ্রূপ লুকিয়ে ছিল। হাসির রেশটা অন্যরকমভাবে শেষ হতেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

হাসি থামিয়ে জড়ানো গলায় পহেলা বলল, 'স্যার, কেউ যখন আমার কথা বিশ্বাস করে না তখন আমি তাকে আমার ডান হাতটা দেখাই...এই দেখুন...।'

চাদরের আড়াল থেকে ডান হাতটা বের করে সামনে বাড়িয়ে দিল পহেলা। আর সেই মুহূর্তেই ওর গল্প আগাগোড়া বিশ্বাস করলাম আমি।

জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, ওর হাতের পাঁচটা আঙুলের মাংস যেন কোন অলৌকিক উপায়ে উধাও হয়ে গেছে। কঙ্কালের হাতের মতো পাঁচটা হাড়ের আঙুল শূন্যে নড়াচড়া করছে। আর সেই সাদা আঙুল থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে এক অপূর্ব গোলাপী আলোর আভা।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে বহু বছর আগে পহেলার দেখা অভিশপ্ত ফাঁকা জায়গাটা জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল।

ভয় পাওয়া মানুষ

চিৎকারটা শুনেই প্রিয়নাথ জোয়ারদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকারটার মধ্যে যেন হিম বরফকুচি মেশানো ছিল। চিৎকারটা যতক্ষণ ধরে চলছিল ততক্ষণের জন্য করিডরের আলোটা যেন মলিন হয়ে গেল—হঠাৎ ভোল্টেজ কমে গেলে যেমন হয়। তারপর, সেই ভয়-পাইয়ে-দেওয়া চিৎকারের রেশ শেষ হলে, বাল্‌বটা আবার তেজ ফিরে পেল।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের সামনে দু-এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। মুখে আলতো করে হাত বুলিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললেন, 'সুনীত। ওর কথাই আপনাকে বলছিলাম। তেতলায় পেছনের দিকটায় ও থাকে।'

প্রিয়নাথ চিৎকারটার কথাই ভাবছিলেন। এমন চিৎকার বুকের ভেতর পর্যন্ত আঁচড় টেনে দেয়। খুব নিচু পরদায় শুরু হয়ে ধাপে-ধাপে ওপরে উঠছে। যেন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে কেউ আইফেল টাওয়ারের মাথায় পৌঁছতে চাইছে। আর যতই ওপরে উঠছে, গলার স্বর ততই চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কেউ হয়তো এরকম চিৎকার করে। হয়তো ভাবে, এই চিৎকারটা তাকে বাঁচিয়ে দেবে। যত উঁচু পরদায় চিৎকার করতে পারবে, তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

চিৎকারটা শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড যেন আলপিন-নিস্তব্ধতা। তারপর বিনোদনারায়ণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথের কানে ভয়ঙ্কর চিৎকারটার রেশ তখনও বাজছিল। পুরনো যত চিৎকার বা আর্তচিৎকার প্রিয়নাথ শুনেছেন সুনীতের চিৎকার এক পলকে সব মুছে দিয়েছে।

বিনোদবাবু বলেছিলেন, ওঁর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ মাঝে-মাঝে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে ওঠে। সেই সঙ্গে আরও কিছু-কিছু বিচিত্র কাজ করে। প্রিয়নাথ যদি এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন তা হলে ভালো হয়। কারণ, ডাক্তার বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের খোঁজ পেয়েছেন লতায়-পাতায়। তারপর একদিন বিকেলবেলা ওঁর নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। প্রিয়নাথকে খুলে বলেছেন নিজের সমস্যার কথা। তারপর কাতরভাবে অনুনয় করে বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন।

'কী করে আপনি বুঝলেন আপনার ভাইয়ের প্রবলেমটা কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার?' সিগারেটে কড়া টান দিয়ে জানতে চাইলেন ভূতনাথ।

কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে ইতস্তত করে বিনোদনারায়ণ বললেন, 'লোকমুখে শুনেছি, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আপনার এলাকা শুরু। সুনীতের জন্যে ডাক্তার-সাইকিয়াট্রিস্ট করে-করে আমি বিজ্ঞানের পুঁজি শেষ করে বসে আছি। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসে হাত পেতেছি। আমার ছোট ভাইটাকে যে-করে হোক বাঁচান। ওর কষ্ট আর সইতে পারছি না। এত হাসিখুশি টগবগে জোয়ান ছেলেটার এই প্যাথেটিক অবস্থা ভাবা যায় না...।'

কথা বলতে-বলতে বিনোদনারায়ণের চোখে জল এসে গিয়েছিল। প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, ছোট ভাইয়ের কথা বলার সময় বড় ভাইয়ের মুখে-চোখে পিতৃস্নেহ ফুটে উঠেছিল—যা আজকের দিনে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রিয়নাথ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে রইলেন। একমনে সিগারেটে টান দিয়ে গেলেন। তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। কবে আপনাদের বাড়ি যাওয়া যায় বলুন...।'

'যেদিন আপনি বলবেন।'

বিনোদনারায়ণদের বাড়ি বসিরহাটে। ওঁদের পিতৃপুরুষ জমিদার ছিলেন। তাই জমিজমা-পুকুর-দিঘির কোনও হিসেব ছিল না। এখনও নয়-নয় করে যা অবশিষ্ট আছে তাও অনেক। পুরনো আমলের বিশাল বাড়িতে ওঁরা তিন ভাই থাকেন। বিনোদনারায়ণ, প্রমোদনারায়ণ, আর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ।

বিনোদনারায়ণ যখন সবে কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছেন তখন ওঁদের বাবা সাপের কামড়ে মারা যান। শ্রাদ্ধ-শান্তি ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি মিটে গেলে হঠাৎই একজন সন্ন্যাসী ওঁদের বাড়িতে আসেন। সকলের হাত দেখে ভাগ্যচর্চা করে তিনি বলে যান, এ-বংশের পুরুষদের অপঘাতে অকালমৃত্যু হবে। এটা নিয়তির অভিশাপ।

তার পরই সুনীতের জন্ম হয়।

এর কয়েক বছর পর বিনোদনারায়ণের মা ম্যালেরিয়ায় মারা যান। প্রমোদ আর সুনীত তখন খুবই ছোট। বিনোদনারায়ণ ওঁদের কোলে-পিঠে করে আগলে রেখে বড় করেন। অভিশাপের ভয়ে তিনি বিয়ে করেননি। সারাটা জীবন সম্পত্তি দেখাশোনা আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থেকেছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নিশিদিন ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন থাকলে অভিশাপ ধীরে-ধীরে কেটে যাবে। কালো ছায়া সরে গিয়ে আবার আলো দেখা দেবে।

'...কিন্তু এমনই ভবিতব্য দেখুন, সুনীত এই অদ্ভুত বিপদে পড়ল।' মলিন মুখে বললেন বিনোদনারায়ণ, 'জানি না, এটা সেই অভিশাপের কোনও ছায়া কি না।'

'আপনার কি মনে হয় কোনও প্রেতাত্মা সুনীতের শরীরে বাসা বেঁধেছে?'


সমীর সরকার

প্রিয়নাথ প্রশ্ন করলেন।

'কী করে বলব!' হতাশভাবে জবাব দিলেন বিনোদবাবু, 'প্রমোদ তো বলছিল সেটাই হয়েছে। ওর চেনা একজন কাপালিক আছে। তাকে নিয়ে এসে কীসব তন্ত্র-মন্ত্র করলেই নাকি সুনীত ঠিক হয়ে যাবে। তা আমি ওর কথায় রাজি হইনি।'

'কেন?'

'প্রমোদ বহুকাল ধরেই কেমন বাউণ্ডুলে গোছের। বাড়ির দিকে মন নেই। সুযোগ পেলেই সাধু-সন্ত তান্ত্রিকদের পেছনে ছুটে বেড়াত—এখনও তাই। মাঝে-মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরে না। যখন-তখন ছাইপাঁশ গিলে বসে থাকে। ওকে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার খুব লজ্জা করে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিনোদনারায়ণ : 'আসলে দোষ আমারই, প্রিয়নাথবাবু—ওকে আমি শত চেষ্টা করেও মানুষ করতে পারিনি। তাই ওর প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং ওর মুখোমুখি হলেই আমি কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগি। নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে যায়। এটা আমার...।'

বিনোদনারায়ণের গলার স্বর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মাথা নিচু করে তিনি নিজেকে আড়াল করতে চাইছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'প্লিজ, আপনি আপসেট হবেন না। আমরা যা চাই সবসময় কি তা হয়! .....আচ্ছা, প্রমোদবাবু বিয়ে করেননি?'

'না।' একটু থেমে তারপর : 'ও যদি নিজে কখনও বিয়ে করে করবে—আমি বড় ভাই হিসেবে কখনও কোনও ইনিশিয়েটিভ নিতে পারব না।'

'ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে প্রমোদবাবু দুঃখ পাননি?'

'পেয়েছে। ওকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। ও আমাদের গর্ব। এলাকার সবাই ওকে পছন্দ করে। লেখাপড়ায় জুয়েল ছেলে। খেলাধুলোতেও দারুণ। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব। সবাই মিলে হইহই করে ট্যুরে যায়, সোশাল ওয়েলফেয়ারের কাজ করে—মানে, করত। সুনীতকে সবাই একডাকে চেনে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই তখন যদি কেউ বলে, ওই যে, সুনীতের বড়দা যাচ্ছে, তখন আমার খুব আনন্দ হয়।'

সাদা শার্টের পাশপকেট থেকে রুমাল বের করে চোখে বুলিয়ে নিলেন বিনোদবাবু। একটু কেশে গলাটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, 'আপনি একবার চলুন। নিজের চোখে সব দেখুন। তারপর...আপনি আমাদের শেষ ভরসা।'

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমি প্রেতসিদ্ধ বা ওঝা নই। তবে ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো আমার নেশা। চেষ্টা করে দেখি আপনাকে কোনওরকম হেল্প করা যায় কি না। আচ্ছা, সুনীত যে চিৎকার করে সেটা ঠিক কী ধরনের?'

'বলে বোঝাতে পারব না, প্রিয়নাথবাবু। আপনি বরং নিজের কানে শুনেই বিচার করবেন।'

প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, কথাগুলো বলার সময় বিনোদনারায়ণের মুখে কেমন যেন অসহায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

এখন, সুনীতের চিৎকার নিজের কানে শোনার পর, প্রিয়নাথ সেই ভয়ের কারণ বুঝতে পারলেন। এই অপার্থিব চিৎকারে বুকের রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে যায়।

'চলুন—ওপরে চলুন।'

বিনোদনারায়ণের কথায় প্রিয়নাথ সংবিৎ ফিরে পেলেন। ভাঙা ক্ষয় ধরা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির বাঁকের মুখে দেওয়ালে বসানো কারুকাজ করা জাফরি। জাফরির ওপরের দিকে তিনটে ছোট-ছোট হরিণ। সময়ের প্রকোপে জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে।

জাফরির ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। বাতাসে নদীর ঘ্রাণ প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে শীতের কামড়।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই উষ্ণতা ওঠা-নামা করছিল। শীত যেন লাজুকভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর উষ্ণতা নামতে শুরু করেছে। শীতও আনুষ্ঠানিকভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

গায়ে উলিকটের গেঞ্জি ও সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ সামান্য কেঁপে উঠলেন।

ঘন-ঘন বাঁক নেওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠছিলেন। প্রিয়নাথ লক্ষ করছিলেন, সরু-চওড়া নানান ধরনের অলিন্দ বাড়িটার নানান দিকে চলে গেছে—অনেকটা ভুলভুলাইয়ার মতন। আলোর ব্যবস্থা বলতে বেশিরভাগই বাল্‌ব। দু-এক জায়গায় টিউব লাইট যে চোখে পড়ছে সেসব নতুন সংযোজন।

দেওয়ালে-দেওয়ালে ড্যাম্পের ছাপ চোখে পড়ছিল। সেইজন্যই হয়তো শীতের সঙ্গে একটা বাড়তি ঠাণ্ডা যোগ হয়ে গিয়েছিল।

তিনতলায় উঠে দুটো তালাবন্ধ ঘরের দরজা পেরিয়ে সুনীতের ঘরের দিকে এগোলেন ওঁরা দুজন। বিনোদনারায়ণ তালাবন্ধ দরজা দুটো পেরোনোর সময় বললেন, 'এত বড় বাড়িতে তিনটে মাত্র প্রাণী। একতলায় আমি, দোতলায় প্রমোদ, আর তেতলায় সুনীত। তাই বাড়তি ঘরগুলো তালাবন্ধই পড়ে থাকে। প্রায় বিশ বছর ওগুলোর দরজা খোলা হয়নি। খুললে হয়তো দেখব ইঁদুর, বাদুড় আর চামচিকে আস্তানা গেড়েছে।'

প্রিয়নাথ কিছু বললেন না।

সুনীতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বিনোদবাবু সামান্য ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরের আলো প্রিয়নাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, অলিন্দের আলো মুছে দিল। আর একইসঙ্গে ঘরের দৃশ্য প্রিয়নাথকে ধাক্কা দিল।

ঘরের এক কোণে সুন্দর ধপধপে বিছানা। সেখানে শুয়ে আছে বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক যুবক। ফরসা রোগা চেহারা। বুকের কাছ পর্যন্ত লেপ টানা। একটা হাত লেপের বাইরে বলেই রোগা চেহারাটা স্পষ্ট করে আন্দাজ করা গেছে।

সুনীতের মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। নাক ঠোঁট সুন্দর। ঠোঁটের ওপরে চওড়া গোঁফ। চোয়ালে দু-একদিনের দাড়ি।

সুনীতের চোখজোড়া প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন না—কারণ, সাদা কাপড়ের পটি দিয়ে ওর চোখ ঢাকা।

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইশারায় ওঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

সুনীতের খাটের কাছে টুলে একজন বয়স্কা মহিলা বসে ছিলেন। রোগা ময়লা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি। দেখে আয়া বলে মনে হয়।

বিনোদনারায়ণ তাঁকে বললেন, 'মাসি, আপনি একটু নীচে গিয়ে বসুন। ডাক্তারবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—ছোড়দাকে দেখবেন।'

ভদ্রমহিলা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বিনোদনারায়ণ জিগ্যেস করলেন, 'ওকে ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন?'

ছোট্ট করে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে মহিলা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, 'সুনীতের চোখ বাঁধা কেন?'

উত্তর দিল সুনীত, 'অন্ধকারে ঘুমোতে আমার ভয় করে। তাই ঘরের আলো জ্বেলে রেখে চোখ বেঁধে ঘুমোতে চেষ্টা করি।'

চোখ ফিরিয়ে সুনীতের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। ও গায়ের লেপ সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে। বাঁ হাতে টান মেরে সরিয়ে দিয়েছে চোখের পটি।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর চোখজোড়া প্রিয়নাথকে মুগ্ধ করল।

বিনোদনারায়ণ ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর ছোট ভাইকে লক্ষ করে বললেন, 'লেপটা গায়ে দে—ঠান্ডা লেগে যাবে।'

বসা অবস্থাতেই সুনীত লেপটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর কৌতূহলী গলায় ভূতনাথকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কীসের ডাক্তার? বডির, না মাইন্ডের?'

ওর প্রশ্নের ধরনে প্রিয়নাথ বেশ মজা পেলেন। বিনোদনারায়ণ একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটায় না বসে আয়া-মাসির ছেড়ে যাওয়া টুলটায় গিয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য নেড়েচেড়ে মজার সুরে পালটা

প্রশ্ন করলেন, 'তোমার অসুখটা কীসের—বডির, না মাইন্ডের? "তুমি" করে বললাম—কিছু মাইন্ড কোরো না।'

বিনোদনারায়ণ সুনীতের পায়ের দিকটায় খাটের এক কোণে বসে পড়লেন। বললেন, 'সুনীত, ইনি হলেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। অনেক রিকোয়েস্ট করে কলকাতা থেকে ওঁকে ধরে এনেছি। আমাদের বাড়িতে ক'দিন থাকবেন...তোকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন। তোর সব কথা তুই ওঁকে খুলে বলতে পারিস।'

সুনীত বারদুয়েক কাশল। লেপটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিনোদনারায়ণের সঙ্গে প্রিয়নাথের চোখাচোখি হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ আগের প্রশ্নটাই আবার করলেন : 'তোমার অসুখটা কীসের—বডির, না মাইন্ডের?'

আচমকা মুখ তুলে তাকাল সুনীত। বলল, 'বডিরও না, মাইন্ডেরও না। অন্য কিছু...।'

বিনোদনারায়ণকে অবাক করে দিয়ে সিরিয়াস গলায় ভূতনাথ বললেন, 'আমি সেই অন্য কিছুর ডাক্তার।'

পলকে ঘরের আবহাওয়া যেন পালটে গেল। বিনোদনারায়ণ উসখুস করতে লাগলেন। সুনীত কেমন চোরাচাউনিতে ভূতনাথকে দেখতে লাগল।

প্রিয়নাথ অফিসের ওপরওয়ালার সুরে বললেন, 'শোনো, সুনীত—তোমার কী হয়েছে আমি বলছি। তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ। কেমন করে তা জানি না। তবে সেই ভয় তোমাকে ধীরে-ধীরে শেষ করে দিচ্ছে। তুমি যদি আমাকে সব খুলে বলো, তা হলে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করে-করে তোমার বড়দা-মেজদাও তো শেষ হয়ে যাচ্ছেন।'

সুনীত হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'কী করে বলব! সে-কথা তো কাউকে বলা বারণ। কাউকে বলামাত্রই সর্বনাশ নেমে আসবে।' একটু থেমে তারপর : '...তবে যদি কেউ নিজে গিয়ে দেখে আসে তা হলে আলাদা কথা...।'

প্রিয়নাথ বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইতস্তত করে বললেন, 'সুনীতের ফটোগ্রাফির শখ আছে। মাঝে-মাঝেই ও ফটো তোলার ঝোঁকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। মাসদুয়েক আগে ও সমস্তিপুরের দিকে গিয়েছিল। সঙ্গে ওর এক বন্ধু—পরেশ—ছিল। কিন্তু রওনা হওয়ার পাঁচদিন পর পরেশ বাড়ি ফিরে আসে। কারণ, বাড়িতে এস. টি. ডি. করে জানতে পেরেছিল ওর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুনীত ফিরে আসে তার ছ'দিন পর। তারপর থেকেই

ওর এই অসুখ। আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি—অথবা, বলতে চায়নি। শুধু "নেহা" আর "সদরিয়া"—এই দুটো শব্দ ওর মুখ থেকে বারবার শুনতে পেয়েছি—তার বেশি কিছু নয়।'

বিনোদবাবু থামলেন।

সুনীত তখনও মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে বিনোদনারায়ণ উঠে ছোট ভাইয়ের কাছে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুনীত মুখ তুলে তাকাল বড়দার দিকে। করুণ গলায় বলল, 'সেই ফটোটার কথা বললে না!'

'ওহ্-হ্যাঁ। ওর তুলে আনা দু-রিল ফটোগ্রাফের মধ্যে আটটা ছবি ব্ল্যাঙ্ক। মানে, ডেভেলাপ করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে একটা ফটো উঠেছে ভারি অদ্ভুত। সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি...।' বলে বিনোদনারায়ণ ঘরের একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেদিকে তাকালেন প্রিয়নাথ।

সুনীতের ঘরটা বেশ আধুনিক ধাঁচে শৌখিনভাবে সাজানো। দেওয়ালে সুন্দর তাক তৈরি করে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বই সুচারুভাবে রাখা। দুটো বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বের করে নিলেন বিনোদনারায়ণ। তারপর প্রিয়নাথের কাছে এগিয়ে এসে খামটা প্রিয়নাথের হাতে দিলেন।

খামের ভেতর থেকে একটা ফটো টেনে বের করলেন প্রিয়নাথ।

ফটোর সবটাই ঘোর কালো এবং ঘন নীল মেশানো একটা অন্ধকার। তারই মাঝে সরষের মাপের অনেকগুলো লাল ফুটকি এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

এই সাদামাঠা ফটোগ্রাফের কী মানে থাকতে পারে প্রিয়নাথ ভেবে পেলেন না।

বিনোদনারায়ণ বললেন, 'এই ছবিটার মধ্যে যে কী আছে কে জানে! এটা দেখলেই সুনীত ভীষণ ভয় পেয়ে আপসেট হয়ে যায়। ও কোথাও গিয়ে কোনও কিছুর ন'টা ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে আটটা ব্ল্যাঙ্ক, আর ন' নম্বরটা এই...।'

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথ সুনীতকে জিগ্যেস করলেন, 'এসব ছবি তুমি কোথায় গিয়ে তুলেছিলে?'

সুনীতের বোধহয় ঘুম পাচ্ছিল। ও ঝিম ধরা চোখে প্রিয়নাথকে জরিপ করছিল। বোধহয় দেখতে চাইছিল ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়। সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে একটু যেন হতাশই হল।

প্রিয়নাথের প্রশ্নে ও অস্পষ্ট গলায় বলল, 'সদরিয়া... নেহা....।'

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান

দিয়ে গেলেন।

বিনোদনারায়ণ চুপচাপ খাটের কোণে বসে পড়লেন, প্রিয়নাথকে লক্ষ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথ মুখ খুললেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'সুনীত, তুমি বোধহয় বাঁচতে চাও না। নইলে সব কথা আমাকে অন্তত খুলে বলতে। আমি কথা দিচ্ছি—কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

সুনীত করুণ গলায় বলল, 'ওরা কাউকে বলতে বারণ করেছে। কাউকে বলা যাবে না। কাউকে না। কেউ যদি নিজে দেখে আসে...।'

'আমি যাব!' জোরালো গলায় বললেন প্রিয়নাথ, 'আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। ওদের কাউকে আমি ভয় পাই না।'

'আমি ভয় পাই...।'

'তুমি বলো কী করে সেখানে যেতে হয়।'

'জানি না।' ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত, '...সদরিয়া...নেহা...।'

প্রিয়নাথ হাতের ফটোটা সুনীতের চোখের সামনে মেলে ধরলেন : 'বলো, কী আছে এই ছবিতে? বলো!'

চোখের পলকে সুনীতের মুখ আতঙ্কে ভেঙেচুরে গেল। ও বিশাল হাঁ করে ঘণ্টাদেড়েক আগের সেই হিমেল চিৎকার শুরু করল।

প্রিয়নাথদের কানে তালা লেগে গেল। ঘরের জানলার শার্সি ঝনঝন করে কাঁপতে লাগল। এক ভয়ঙ্কর অনুনাদ ঘরের আবহাওয়াকে পাগল করে দিল।

বিনোদনারায়ণ লাফিয়ে উঠে ছোট ভাইকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তীব্র চোখ সারাক্ষণ সুনীতকে লক্ষ করছিল।

আয়া-মাসি ভেজানো দরজা ঠেলে তাড়াহুড়ো করে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখে-চোখে উদ্বেগ।

সুনীত হাঁফাচ্ছিল। ওর চোখ আধবোজা মতন হয়ে গেছে। বিনোদনারায়ণ ওকে ধীরে-ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাসিকে লক্ষ করে বললেন, 'মাসি, আপনি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমরা যাচ্ছি—।'

প্রিয়নাথ আর বিনোদনারায়ণ সুনীতের ঘর ছেড়ে অলিন্দে বেরিয়ে এলেন। উজ্জ্বল আলো থেকে স্তিমিত আলোয় আসায় প্রিয়নাথের দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তিনি বিনোদনারায়ণকে বললেন, 'ফটোগ্রাফটা আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি সুনীতের সঙ্গে কথা বলব। আপনার কোনও আপত্তি নেই

তো?'

'আপত্তি!' মলিন আলোয় বিনোদনারায়ণের হাসিটা কেমন যেন দেখাল। নরম গলায় তিনি বললেন, 'সুনীতকে সুস্থ করে তোলার জন্যে কোনও কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।'

ওঁরা সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় নেমে এসেছিলেন। তখনই কানে এল জড়ানো গলায় গান : '...কারণ সেবায় বারণ করো, জানতে পারি কারণটা কী...?'

'প্রমোদ।' চাপা গলায় বললেন বিনোদবাবু, 'এসব নাকি ওর তন্ত্র সাধনার অঙ্গ। হুঃ!'

প্রিয়নাথ কোনও কথা বললেন না।

'রাত অনেক হল। চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।'

প্রিয়নাথকে একতলার খাওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে চললেন বিনোদনারায়ণ।

জাফরির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, বাইরে অন্ধকার আর শীতের রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে।

টিনের বাক্স লাগানো সাইকেল-ভ্যান নিয়ে যারা পাঁউরুটি আর বিস্কুট দোকানে-দোকানে জোগান দেয় তাদের কথা মনে পড়ল প্রিয়নাথের। পাঁউরুটি আর বিস্কুটের বদলে যদি বেশ কিছু কাচের মার্বেল সেই বাক্সে ভরে ভ্যানটাকে সদ্য-ধান-কাটা কোনও চাষ-জমির ওপর দিয়ে চালানো হয়, তা হলে যেরকম ঝাঁকুনি ও শব্দ হবে তার সঙ্গে এই বাসটার চলার দারুণ মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন তিনি।

সমস্তিপুরে নেমে সরু লাইনের ট্রেনে চড়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পথ চলার পর তিনি নেমেছিলেন কাম্‌নিতাল স্টেশনে। সেখান থেকে বাস ধরেছেন—তবে বাসটাকে দোমড়ানো-তোবড়ানো ক্যানেস্তারা বলাই ভালো। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ছুটে চলা বাসের শব্দ আর ঝাঁকুনি প্রিয়নাথকে প্রায় কাহিল করে দিচ্ছিল। যদিও বাসের নাম 'উড়ন খটোলা'।

আশার কথা একটাই। এই বাস তাঁকে সদরিয়া নিয়ে যাবে। তারপর...সেখানে নেমে...খুঁজে বের করতে হবে নেহাকে।

জানলার বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেছে। স্তিমিত রোদে ছুটে চলা গম-ভুট্টা-জওয়ারের খেত আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সামান্য খোলা কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে ছুটে-আসা বাতাস ক্রমে আরও ঠান্ডা হচ্ছিল। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন, মাফলারটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

ভিড়ে ঠাসা বাসের ভেতরে অনেক যাত্রীই বিড়ির নেশায় ব্যস্ত। বোধহয় 'নো

স্মোকিং' কথার 'নো'-টা বাসের দেওয়াল থেকে মুছে গেছে বলে।

খানিক ইতস্তত করে অস্বস্তি কাটিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সুনীতনারায়ণের সমস্যার দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎই তাঁর মাথার ভেতরে সুনীত হাড়-কাঁপানো ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল।

আর প্রিয়নাথের সাতদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বসিরহাটের কথা। ঘোরালো প্যাঁচালো অলিন্দ আর সিঁড়িতে জট পাকানো প্রকাণ্ড বাড়িটার কথা।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রিয়নাথের চোখে ঘুম আসেনি।

দোতলার একটা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিছানায় বসে নোটবই আর পেন নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানান মন্তব্য লিখেছেন প্রিয়নাথ। সুনীতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, বিনোদনারায়ণের কাছ থেকে শোনা কিছু জরুরি কথা, আর নিজের মতামত। সেইসঙ্গে লিখে নিয়েছেন, এরপর তাঁকে কী-কী কাজ করতে হবে।

লেখা-টেখার কাজ শেষ হলে পর প্রিয়নাথ ঘর অন্ধকার করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে শুলে তাঁর কেমন যেন দম আটকে আসে। তাই পায়ের দিকের একটা জানলার পাল্লা অর্ধেকটা খুলে রেখেছিলেন। সেটা নিশ্চয়ই পুব দিক—কারণ, চাঁদের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছিল।

বহু চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না। বিছানায় উসখুস করছিলেন। হঠাৎই জড়ানো গলায় গানের কলি শুনতে পেলেন : 'নৃমুণ্ডমালিনী তারা/মুণ্ডমালা কোথায় পেলি...।'

প্রমোদনারায়ণ। দোতলার বাসিন্দা—প্রিয়নাথের প্রতিবেশী।

রাতে খাওয়ার সময় প্রমোদনারায়ণের দেখা পাননি প্রিয়নাথ। এখন ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে কেমন হয়!

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন চওড়া বারান্দার শেষ প্রান্তে, খানিকটা চাতাল মতো জায়গায়, একজন ছায়া-মানুষ বসে আছে। তার শরীর অন্ধকার আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি।

পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ। আলতো করে ডাকলেন, 'প্রমোদবাবু—।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ।

একমুখ দাড়ি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, কপালে লাল তিলক—চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে। আর গভীর চোখদুটো নিশাচর প্রাণীর মতো অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ : 'ও, ভূতনাথবাবু!

আসুন...বসুন। মায়ের চরণ ধোওয়া চাঁদের আলো...এর কোনও জবাব নেই।'

চাতালে সতরঞ্জি পাতা ছিল। ভূতনাথ তার ওপরে বসে পড়লেন। খোলা জায়গায় বেশ শীত করছিল। গায়ের শাল আরও ঘন করে জড়িয়ে নিলেন।

অন্ধকারে বেশ কিছু গাছের মাথা আর দু-একটা বাড়ি চোখে পড়ছে। একটা প্যাঁচা নিঃশব্দে উড়ে গেল। কয়েকটা জোনাকি আলোর ফুটকি জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে পড়ে গেল সুনীতের ফটোটার কথা।

শীতের বাতাস যেমন-তেমন বইছিল। প্রিয়নাথের নাকে মদের গন্ধ ভেসে আসছিল।

'শুনেছি, আপনি সুনুকে সারিয়ে তোলার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন।' প্রমোদনারায়ণ কথা বললেন, 'আমিও ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু দাদা এমন ঝামেলা করে! কিছুতেই বোঝে না ধর্মকর্ম এক জিনিস আর তন্ত্র আর-এক জিনিস। আমার সাধনায় বারবার বিঘ্ন ঘটায়...।' বেশ বিরক্ত-ভাবে কথা শেষ করলেন প্রমোদবাবু।

প্রিয়নাথের কৌতূহল হল। ওঁকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কীভাবে সুনীতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন একটু বলবেন?'

'বললাম যে—তন্ত্র দিয়ে। সবাই জানে, তন্ত্রশাস্ত্র চিরন্তন—প্রত্যক্ষ ফল দেয়। তন্ত্র স্বয়ং মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। একে কেউ কখনও অবজ্ঞা করে!' একটু থেমে প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'সুনীতের জন্যে আমি ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র প্রয়োগ করেছি।'

'সেটা কী জিনিস?'

'চলুন—আমার ঘরে চলুন—দেখাচ্ছি।'

প্রমোদনারায়ণ চাতাল ছেড়ে উঠে পড়লেন। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে অনুসরণ করলেন।

ঘরটা যথেষ্ট প্রাচীন, আর মাপে বেশ বড়। মেঝে পর্যন্ত লম্বা-লম্বা জানলা। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা।

ঘরের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আর ছক আঁকা। শিব ও কালীর বড়-বড় দুটো ফটো মালা দিয়ে সাজানো। ঘরের মেঝের এককোণে বইয়ের গাদা। তার পাশে চারটে তাকও বইয়ে ঠাসা।

ঘরের ডানদিক ঘেঁষে অগোছালো ময়লা বিছানা। বিছানার পাশে টেবিলে মদের বোতল, গ্লাস, আর চশমা।

সব মিলিয়ে ঘরটায় কেমন যেন অগোছালো উচ্ছৃঙ্খল ছাপ।

হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে প্রিয়নাথকে বসতে বললেন প্রমোদনারায়ণ। তারপর টেবিল থেকে চশমাটা চোখে দিয়ে খাটের তলায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

অবশেষে খুঁজে পেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে লাঠির মতো গোল করে পাকানো একটা কাগজ। সেটা ভূতনাথের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই দেখুন—ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র।'

ভূতনাথ দেখলেন, একটা ভূর্জপত্রে ছক কেটে কয়েকটা সংখ্যা লেখা :

৪	৫৬	১৬	৬০
৩১	৪৪	২০	৪০
৫২	৭	৩৪	১২
৪৮	২৮	৩৬	২৪

প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে অষ্টগন্ধ দিয়ে লিখে রেখেছি। দাদাকে লুকিয়ে সুনীতের ঘরের দেওয়ালে—খাটের নীচে—সিঁদুর দিয়ে এই যন্ত্র লেখা আছে। এ ছাড়া শ্মশানে গিয়ে কিছু ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করছি। একটু-একটু কাজ হচ্ছে...আরও হবে। আসলে সুনু যে কোনওরকম হেল্প করছে না।'

প্রমোদনারায়ণের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সেটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'আচ্ছা, সুনীত যে বারবার "সদরিয়া" আর "নেহা" শব্দ দুটো বলছে, তার অর্থ কী?'

প্রমোদবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল। ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি। তাতে আমার যা মনে হয়েছে, সদরিয়া কোনও জায়গার নাম—সমস্তিপুর থেকে যাওয়া যায়। আর নেহার ব্যাপারে জিগ্যেস করলে সুনু বলছে সেটা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে...বলা যাবে না।'

রাতের আকাশে কুকুরের কাতর চিৎকার শোনা গেল।

প্রিয়নাথ চুপ করে ছিলেন। প্রমোদনারায়ণকে দেখছিলেন।

প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'আপনি কাল সকালে ওকে একবার জিগ্যেস করে দেখুন। যদি নতুন কোনও তথ্য পান...। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না...।'

শেষ কথাটা বলার সময় তন্ত্রসাধক মানুষটার গলা ভারি হয়ে এল। প্রিয়নাথ টের পেলেন, লোকে যা-ই বলুক না কেন, মানুষটার ভেতরে এখনও একটা স্নেহশীল মেজদা অবশিষ্ট আছে।

ওঁকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এলেন ভূতনাথ। বিছানায় গা ঢেলে দিতেই ঘুম দু-চোখে আসন পেতে বসল। ঘুমের ঘোরে সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটাকে

স্বপ্ন দেখলেন। তবে ফটোর লাল ফুটকিগুলো জোনাকির মতো জ্বলছিল-নিভছিল।

বাসের প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি প্রিয়নাথের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে দিল। কন্ডাক্টর দেহাতী ঢঙে হাঁক পাড়ল : 'সদরিয়া! সদরিয়া!'

সিট ছেড়ে উঠে বাঙ্ক থেকে সুটকেসটা নিলেন প্রিয়নাথ। প্রায় ধস্তাধস্তি করে ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে পড়লেন রুক্ষ রাস্তায়।

এটা যে সদরিয়া নয় সেটা প্রিয়নাথ খোঁজখবর করে অনেক আগেই জেনেছেন। তবে এখান থেকে টাঙ্গা পাওয়া যায়। টাঙ্গা নিয়ে যায় গণ্ডক নদীর পাড়ে। সেখান থেকে খেয়া পার হয়ে আবার টাঙ্গায় চড়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে সদরিয়ার দেখা পাওয়া যাবে।

এতসব কাণ্ড করে প্রিয়নাথ যখন সদরিয়ায় পা রাখলেন তখন অন্ধকার এবং শীত জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। কুয়াশা ঠেলে একটা চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ালেন।

দোকানে চার-পাঁচজন মানুষের জটলা। ওরা সব মুড়ি দিয়ে বসে কাঠের আগুন ঘিরে তাপ নিচ্ছে। গায়ে চাদর অথবা কম্বল। মাথায়-গলায় মাফলার, নয় গামছা।

দোকানে ঢুকে উনুনের কাছাকাছি একটা ভাঙা কাঠের বেঞ্চে বসলেন প্রিয়নাথ। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে এক গ্লাস চা আর দুটো বিস্কুট দিতে বললেন।

প্রিয়নাথ দোকানে ঢোকামাত্রই দোকানের লোকজন কথাবার্তা থামিয়ে চুপ করে ওঁকে দেখছিল। প্রিয়নাথের চেহারা ও পোশাকে ভিনদেশি ভাব কটকট করছে। প্রিয়নাথের মনে হল, ওরা কেমন সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। কোনও কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

ঠিক এইরকম সতর্ক দৃষ্টি সুনীতনারায়ণের চোখেও দেখেছেন প্রিয়নাথ। প্রমোদনারায়ণের সঙ্গে কথা বলার পরদিন সকালে সুনীতের ঘরে গিয়ে আর-এক দফা চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিরাট কিছু লাভ হয়নি। 'সদরিয়া' আর 'নেহা' শব্দ দুটো আলোচনায় এসে পড়তেই প্রিয়নাথ জানতে চেয়েছেন, 'তুমি সদরিয়ায় গিয়েছিলে না?'

'হ্-হ্যাঁ...মানে...।'

'কী করতে গিয়েছিলে?' তীব্র স্বরে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন ভূতনাথ।

'ফ...ফটো তুলতে...ঘুরতে...।' কেমন যেন ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত।

'সমস্তিপুর থেকে সদরিয়া কেমন করে যেতে হয়?'

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেল সুনীত। ওর মুখটা চোখের পলকে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাঁপা গলায় ও বলল, 'না, না—ওখানে যাইনি। ওখানে কেউ যায় না। আসল জায়গাটা আরও ভেতরে...কেউ সেখানে যায় না... আমাকে বলতে বারণ করেছে।'

'কে বারণ করেছে?'

ভূতে পাওয়া মানুষের মতো কেঁপে উঠল সুনীত। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'ওরা...ওরা বারণ করেছে। নেহা...নেহা...।'

'নেহা মানে কী?' সুনীতের হাত চেপে ধরে ওর মুখের ওপরে একরকম ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ, 'কে নেহা? কী নেহা?'

সুনীত মাথা নিচু করল। ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। গোঙানির স্বরে বলল, 'জানি না। আর কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন...প্লিজ...প্লিজ...।'

প্রিয়নাথ ওর অনুনয় আর কান্নাকে পাত্তা দেননি। নাছোড়বান্দার মতো বলেছেন, 'তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ? এখন তো দিনের আলো...এখন কীসের ভয়!'

সুনীত কান্না থামিয়ে ভূতনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বলেছে, 'না, এখন ভয় নেই। কিন্তু দিনের পর তো রাত আসবেই...তখন? তখন ওরাই সব...ওদের গোপন কথা আমি ফাঁস করতে পারব না। কেউ যদি নিজে থেকে জানতে পারে তা হলে ঠিক আছে। আমি কিছু বলতে পারব না—।'

এরপর সুনীত মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

এখন এই কুপির আলোয় বসে থাকা শীতে ঘেরা মানুষগুলোও যেন সুনীতের মতো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে।

ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গ্লাস প্রিয়নাথের হাতে এগিয়ে দিল দোকানদার—সঙ্গে দুটো বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দোকানদারের সঙ্গে একরকম জোর করেই আলাপ জুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ। এই শীতের রাতে একটা আশ্রয় না পেলে তিনি থাকবেন কোথায়!

বহু চেষ্টা করে যেটুকু জানা গেল তা হল : রাতে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল। অচেনা মানুষকে কেউ এখানে আশ্রয় দেয় না। সেইজন্যই সন্ধের সময় বাঙালিবাবুকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। তবে এখনও সময় আছে। টাঙ্গা নিয়ে বাস-রাস্তায় গেলে সাতটার লাস্ট বাসটা ধরা যাবে। সেটাই বাবুজির পক্ষে ভালো হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পথে নামলেন প্রিয়নাথ। সুনীত কি এখানে সত্যিই এসেছিল? রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল ও? যদি রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পাওয়া যায়...।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রিয়নাথ কাঁচা সড়ক ধরে টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছিলেন, হঠাৎই কানে এল মলের ঝমঝম শব্দ।

ঘুরে তাকালেন প্রিয়নাথ।

বছর তেরো-চোদ্দর একটি ফুটফুটে কিশোরী। পরনে ঘাগরা, চোলি, চাদর, ওড়না। পোশাক মলিন। তবে রূপ আছে। রাস্তার আলো কম—কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটির রূপ আড়াল করা যায়নি।

প্রিয়নাথ নানা জটিল ভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। মেয়েটি ওঁর চোখে তাকিয়ে এমন সরল সুন্দরভাবে হাসল যে, সব দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

মেয়েটির বাঁ হাতে ঝুলছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা তোবড়ানো ক্যান। আর ডান হাতের মুঠোয় বোধহয় পয়সা।

ওর হাসিতে কেমন একটা ভরসা ছিল, প্রচ্ছন্ন আবাহনও ছিল যেন। হয়তো সেই কারণেই প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করে বসলেন এখানে রাতে থাকার কোনও জায়গা পাওয়া যাবে কি না।

প্রিয়নাথের জোড়াতালি দেওয়া ভাষা মেয়েটি দিব্যি বুঝতে পারল। মিষ্টি হেসে জবাব দিল, 'কিঁউ নহী! জরুর মিলবে। হামার ঘর হ্যায় উধর—।' আঙুল তুলে পশ্চিমদিকের অন্ধকার দেখাল মেয়েটি।

দুশ্চিন্তা নিমেষে মুছে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ভ্রমণের ধকল তাঁকে মুহূর্তে যেন কাবু করে দিল।

মেয়েটি তাঁকে ডাকতেই প্রিয়নাথ ওর পিছু নিলেন।

মলিন আলোয় এবড়োখেবড়ো পথ ধরে শীত আর কুয়াশা ভেদ করে দুটি প্রাণী এগিয়ে চলল।

একটু এগোতেই রাস্তার আলো আর চোখে পড়ল না। ভাঙা চাঁদের ঘোলাটে আলোই একমাত্র ভরসা।

গোলকধাঁধার মতো পথ ঘুরে-ঘুরে অবশেষে একটা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। আবছা আলো-আঁধারিতে বাড়িটাকে ভুতুড়ে অবয়ব বলে মনে হচ্ছিল।

যতটুকু বোঝা যায়, টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। বাড়ি ঘিরে উঠোন। উঠোনে বেশ কয়েকটা কলা গাছ, পেঁপে গাছ আর সুপুরি গাছ। উঠোনের একপাশে ধুনির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে আগুনটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

সামান্য বাতাস বইছিল। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে সরসর শব্দ হচ্ছিল।

প্রিয়নাথের মনে হল, ঘুমিয়ে নিথর একটা গাঁয়ের শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বাড়িটার চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জমি। আর আলো বলতে মাথার ওপরে চাঁদ, আর বাড়ির একটা জানলা দিয়ে ভেসে আসা লণ্ঠনের আলো।

প্রিয়নাথের শীত করছিল। মাফলারটা আরও ভালো করে গলায় জড়িয়ে

নিলেন।

'এই আমাদের ঘর, বাবুজি।' মেয়েটি আলতো গলায় বলল।

প্রিয়নাথের হঠাৎই মনে হল, ওদের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন অথচ এখনও ঠিকমতো আলাপ করা হয়নি। মানে, মেয়েটির নামও জিগ্যেস করা হয়নি।

'তোমার নাম কী?' প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

তাঁর দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'নেহা—নেহাকুমারী—।'

প্রিয়নাথ ওই শীতার্ত আঁধারে দাঁড়িয়ে সুনীতনারায়ণের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনতে পেলেন। তাঁর পা ফেলার ছন্দে গরমিল হয়ে গেল। সুটকেসটাও হাত থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। সময়মতো সতর্ক না হলে সেটাকে সামাল দেওয়া যেত না।

কাঁচা উঠোন পেরিয়ে সামনের ঘরটায় ঢুকতেই উষ্ণতার ওম পেলেন প্রিয়নাথ। ঘরের হ্যারিকেনের আলোয় নেহাকে ভালো করে দেখলেন। এই মিষ্টি মেয়েটা কি সুনীতের ভয়ের কোনও হদিস দিতে পারবে!

ঘরে একটা ভাঙা চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। চাদর মুড়ি দেওয়া শরীরে শুধু মাথার সাদা চুল, সাদা গোঁফ, আর ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখ নজর টানে।

নেহা পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, ওর বাপুজি। তারপর দেহাতী ভাষায় ওর বাবাকে কী যেন বলল। উত্তরে বৃদ্ধ মানুষটি আলতো করে বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন।

নেহা প্রিয়নাথকে বসিয়ে ছুটে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই একজন বৃদ্ধা ও একজন তরুণকে একরকম হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এল। নেহার মা ও দাদা।

বৃদ্ধার মুখের চামড়ায় অকালে বড় বেশি ভাঁজ পড়েছে। তবে চোখ দুটোয় মায়ের মমতা মাখানো। নাকে রুপোর নোলক, কানে দুল। মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে।

নেহার দাদার রোগা কালো চেহারা। চোখ দুটো কেমন যেন শূন্য, দৃষ্টিহীন। কপালে লম্বা একটা কাটা দাগ। মাঝে-মাঝেই কেশে উঠছে—বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে।

একটা অদ্ভুত গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। অনেকটা বুনো ফুলের গন্ধের মতো।

আলাপের পালা শেষ হলে নেহা প্রিয়নাথকে ভেতরদিকের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। বলল, 'এ-ঘরেই আপনি থাকবেন। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন,

আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

নেহা হাত-পা নেড়ে কথা বলছিল। ওর ভাষা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ওর অঙ্গভঙ্গি ভূতনাথকে বুঝতে সাহায্য করছিল। নেহার সঙ্গে আলাদা কথা বলার জন্য ভূতনাথের আর তর সইছিল না।

সুটকেস খুলে দরকারি জিনিসপত্র বের করে খাটিয়ার ওপরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসলেন ভূতনাথ। নেহার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই নেহা চা নিয়ে এল। প্রিয়নাথের হাতে চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে মেঝেতে চাটাই পেতে বসে পড়ল। বুনো ফুলের গন্ধটা আবার প্রিয়নাথের নাকে এল।

'বাবুজী এখানে কী কাজে এসেছেন?'

'এই একটু-আধটু ঘুরে বেড়াতে...ফটো তুলতে।' একটু থেমে আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ, 'আচ্ছা, মাস দেড়-দুই আগে কোনও ছোকরা বাবু তোমাদের বাড়িতে এসেছিল? বাবুর খুব ফটো তোলার শখ ছিল...।'

নেহা সরলভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এসেছিল। বড় রাস্তায় এদিক-ওদিক ঘুরছিল, আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে দু-চারদিন ছিল। এখানে আনজান আদমিকে কেউ বাড়িতে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমরা কোনও মেহ্মানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে মেহ্মান আসে। আমি ডেকে নিয়ে আসি।'

'সেই ছেলেটির নাম কী ছিল? সুনীত?' প্রিয়নাথ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঢ় টান দিলেন।

'নাম তো জানি না, বাবুজী।' নেহা হাসল ফিক করে, বলল, 'আপনার নামও কি জানি?'

প্রিয়নাথ নিজের নাম বললেন। বললেন ফটো তোলার শখের কথা। তারপর শহরের টুকটাক গল্প শোনাতে লাগলেন। চা-সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎই গল্পের মাঝে লাফিয়ে উঠে পড়ল নেহা। বলল, 'এখন যাই, বাবুজী। দেরি হয়ে গেছে।'

ফুটফুটে প্রাণবন্ত কিশোরীটির মুখের দিকে তাকালেন প্রিয়নাথ। কীসের দেরি হয়ে গেছে! প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়ল।

নেহা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে থালা আর বাটিতে নিয়ে এল রুটি ও সবজি। প্রিয়নাথের 'ডিনার'। মেঝেতে থালা-বাটি সাজিয়ে কাঁসার গ্লাসে জল দিয়ে গেল নেহা। সঙ্গে একটা বাড়তি হ্যারিকেন। কিন্তু সেই আলোয় মলিন ঘরটা যেন আরও মলিন হয়ে উঠল।

প্রিয়নাথের অন্তত তাই মনে হল।

নেহা যাওয়ার আগে বলে গেল, খাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো দরজার বাইরে রেখে দিতে। আর বাবুজি যেন বাইরের উঠোনে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন।

নেহা খুব ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলল, 'এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন—আবার কাল দেখা হবে।'

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজেনি, অথচ শীত, অন্ধকার, আর নির্জনতা ঘড়ির কাঁটা যেন তিন-চার ঘন্টা এগিয়ে দিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে জুত করে বসলেন প্রিয়নাথ। একটা সিগারেট ধরালেন। হ্যারিকেন দুটো নিভু-নিভু করে দিয়েছেন। ফলে সিগারেটের আগুনটাই বেশ জোরালো মনে হচ্ছে।

আষ্টেপৃষ্ঠে কম্বল মুড়ি দিয়ে নানান কথা ভাবছিলেন। দু-মাস আগে এখানে এসে সুনীত ঠিক কী-কী করেছিল? প্রিয়নাথ কি এখন সেই ভূমিকায় হুবহু অভিনয় করে যাচ্ছেন? টিভিতে দেখা অ্যাকশন রিপ্লের মতো?

নেহাদের চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। ওরা কি এখনও শোয়নি? নেহা তা হলে অমন ব্যস্তভাবে চলে গেল কেন?

একটু পরে সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওঁর ক্লান্ত শরীর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল প্রিয়নাথের।

আড়মোড়া ভেঙে দিন শুরু করতে গিয়েই বেশ অবাক হয়ে গেলেন। নেহারা কেউ বাড়ি নেই!

ওরা চারজন এই সকালবেলায় গেল কোথায়!

গোটা বাড়িটাই চক্কর মেরে দেখলেন প্রিয়নাথ। কেউ কোথাও নেই! সব ক'টা দরজাই হাট করে খোলা। অথচ আসবাবপত্র, রান্নার জায়গা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় ওরা আবার যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে।

এককাপ চায়ের জন্য মনটা আনচান করছিল। তাই মোটামুটি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। সঙ্গে নিলেন ক্যামেরা আর কম্পাস।

কুয়াশা কম থাকায় সূর্যের দাপট নেহাত মন্দ নয়। সামান্য ঘোলাটে দিনের আলোয় এলাকাটা আরও ভালো করে দেখলেন।

নেহাদের বাড়িটা বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে। চাষজমি আর পুকুর পেরিয়ে আরও যে-দু-চারটে মাটির বাড়ি চোখে পড়ে সেগুলোতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। আর দূরে তাকালে শুধু ধূ-ধূ মাঠ আর বড়-বড় গাছপালার দল। মনে হয় যেন নেহাদের বাড়িটাই লোকবসতির

শেষ সীমানা।

প্রিয়নাথ আন্দাজে ভর করে এগোলেন। খানিক দূর গেলে হয়তো কাল রাতের ঘর-বাড়ি দোকানপাট চোখে পড়তে পারে।

পথে বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন। পকেট থেকে কম্পাস বের করে মাঝে-মাঝেই উত্তরদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখলেন, বেশ দূরে মেঠো পথ ধরে তিনজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করলেন। একটু পরেই ওদের ধরে ফেললেন। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। তার মধ্যে একজনের বয়েস এত কম যে, অনায়াসে 'মেয়ে' বলা যায়। আর পুরুষটির হাতে একটা সুটকেস।

প্রিয়নাথ হাঁফাতে-হাঁফাতে পুরুষটিকে জিগ্যেস করলেন, 'কোনদিকে গেলে খাবার-দাবারের দোকানপাট পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

লোকটি প্রিয়নাথের পোশাক-আশাক চেহারা খুঁটিয়ে মেপে নিল। তারপর বলল, 'চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি—পথে দোকানপাট পড়বে।'

মেঠো পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে লোকটির সঙ্গে আলাপ করলেন প্রিয়নাথ। ওর নাম মহাবীর সাউ। সঙ্গে ওর বউ অম্লাদেবী, আর ছোট মেয়ে হীরাকুমারী। ও দ্বারভাঙ্গার সিরৌলি গাঁয়ে থাকে। সদরিয়ায় এসেছিল বউয়ের জড়িবুটি চিকিৎসার জন্য। এদিকে একজন ধন্বন্তরী সাধুবাবা বসেন, তাঁর কাছে। ফেরার পথে লহ্রিয়াসরাই-এ একটু কাজ সেরে ফিরবে—তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছে।

মহাবীরের কাছ থেকে এদিকটার খুব একটা বিশদ খবর পাওয়া গেল না। তবে ও প্রিয়নাথকে একটা চায়ের দোকানে পৌঁছে দিল। প্রিয়নাথ ওদের তিনজনের ফটো তুললেন। ওরা হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

প্রিয়নাথ চায়ের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস চা নিয়ে বসলেন। ঠিক করলেন, আজ সারাটা দিন নেহাদের সম্পর্কে, সুনীতের ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। এখানকার মানুষজন কথাবার্তায় এত সহজ সরল, অথচ অচেনা মুসাফিরকে কিছুতেই আশ্রয় দেয় না। কেন? সে কি ভয়ে? তা হলে সবাই যে-ভয় পায় নেহারা সেই ভয় পায় না কেন! বরং নেহার কথা অনুযায়ী 'আমরা কোনও মেহ্মানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে...।'

সারাটা বেলা নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছবি তুলে কাটালেন প্রিয়নাথ। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান এতটুকুও এগোল না। নেহাদের কেউ চিনতেই পারল না। ওদের বাড়িটা কোন দিকে সেটা আন্দাজ করে বলা সত্ত্বেও কোনও

লাভ হল না। সবাই ঠোঁট উলটে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, আর প্রিয়নাথকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

সুতরাং, একরকম ব্যর্থ হয়েই, বেলা দেড়টা নাগাদ নেহাদের বাড়িতে ফিরলেন প্রিয়নাথ। তবে ফেরার কাজটা মোটেও সহজ হয়নি। বহু লোককে জিগ্যেস করে নানান গাছ আর বাড়ির নিশানা দেখে অবশেষে ফিরতে পেরেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য! নেহাদের বাড়িটা সেই সকালের মতোই একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা প্রিয়নাথ পথেই সেরে এসেছিলেন। এখন কোনওমতে স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে আস্তানা গড়লেন। নোটবই বের করে তাতে আধঘন্টা ধরে নানারকম মন্তব্য লিখলেন।

প্রিয়নাথ যখনই কোনও অভিযানে বেরোন তখনই সঙ্গে নেন তাঁর বিশেষ সরঞ্জামের থলে। এবারও সেটা সঙ্গে এনেছেন। তাতে আছে ক্যামেরা, টর্চ, প্রচুর ব্যাটারি, মোমবাতি, মার্কার, থার্মোমিটার, কম্পাস, আর পেন্ডুলাম।

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে সুটকেস খুলে থলে থেকে পেন্ডুলামটা বের করে নিলেন। সুতো ধরে ঝুলিয়ে ওটাকে দোলাতে লাগলেন। দুলুনিটা সামান্য এলোমেলো হচ্ছে বলে প্রিয়নাথের মনে হল। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল।

প্রিয়নাথ পেন্ডুলামটা রেখে দিলেন। দরজা বন্ধ করে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন খাটিয়ায়। মনে-মনে ঠিক করলেন, এখানে দু-একদিনের বেশি তিনি আর থাকবেন না। সুনীতের ভয় পাওয়ার রহস্যের কাছে হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হবে।

সন্ধের আঁধার নেমে আসতেই প্রিয়নাথ হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়েছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নেহারা যদি নিতান্তই আর না ফেরে তা হলে ওদের রান্নার জায়গা হাতড়ে যা পাবেন তাই দুটো মুখে গুঁজে দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর ভোর হলেই মহাবীরের চিনিয়ে দেওয়া পথ ধরে সোজা চম্পট।

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ নেহাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

বেশ অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, তার আগেই চঞ্চল পায়ে নেহা ঘরে এসে ঢুকল।

'বাবুজী, ভালো আছেন।' ওর মুখে সেই একই নিষ্পাপ হাসি।

'তোমরা হুট করে কোথায় চলে গিয়েছিলে!'

মাথা নিচু করল নেহা। তারপর অপরাধীর চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজী, রাগ করবেন না। রোজ আমাদের ওরকম চলে যেতে হয়। রাত পেরোনোর আগেই আমরা চলে যাই...আবার অন্ধেরা নেমে এলে ফিরে আসি।'

'কোথায় যাও? কী দরকার সেখানে, যে রোজ যেতে হয়!' প্রিয়নাথ একটু যেন বিরক্তই হলেন।

'আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি। এসে সব বলছি—।' বেণী দুলিয়ে নেহা চলে গেল।

মিনিটপাঁচেক পরেই নেহা ফিরে এল। হাতে গরম চায়ের গ্লাস।

প্রিয়নাথের হাতে গ্লাসটা দিয়ে কাল রাতের মতোই মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর খানিকটা যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, 'রোজ আমাদের যেতে হয়, বাবুজী। কেন যেতে হয় সেটা...আপনি আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

নেহার প্রস্তাবটা এত আচমকা এল যে, প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

নেহা আপনমনে বিড়বিড় করে বলে চলল, 'আমাদের বাড়িতে যেসব মেহ্‌মান আসে তাদের আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই। আমরা...ওখানে গেলে আপনি ফোটো খিঁচতে পারবেন।' শেষ কথাটা নেহা বেশ উৎফুল্ল ঢঙে বলল। উৎসাহ নিয়ে তাকাল ভূতনাথের দিকে।

প্রিয়নাথের মধ্যে কেমন একটা মরিয়া ভাব জেগে উঠেছিল। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'সুনীতবাবু তোমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন...ছবি তুলতে...?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন।' ঘাড় নেড়ে বলল নেহা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'ওই বাবুর নাম তো জানি না—।'

'আমি আজ তোমাদের সঙ্গে যাব।'

চাটাই ছেড়ে উঠে পড়ল নেহা। খুশির গলায় বলল, 'যাই, মা আর পিতাজীকে বলে আসি। রাতে আপনার খাওয়া হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে গাঢ় আঁধার ও শীতের মধ্যে প্রিয়নাথ যখন ওদের সঙ্গে বেরোলেন তখন রাত সাড়ে ন'টা।

শীতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রিয়নাথের চেহারা মাপে প্রায় সুমো যোদ্ধাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। সঙ্গের ঝোলা ব্যাগে ক্যামেরা ছাড়াও নিয়েছেন, টর্চ, টর্চের ব্যাটারি, কম্পাস, থার্মোমিটার, আর পেন্ডুলাম।

অন্ধকারে কুয়াশা ভেদ করে আরও অন্ধকার পাঁচটা ছায়া এগোচ্ছিল। সকলের আগে প্রিয়নাথ আর নেহা। পিছনে বাকি তিনজন। কারও মুখে কোনও কথা

নেই। যেন শবানুগমনে চলেছে সবাই।

প্রিয়নাথ হঠাৎই হোঁচট খেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে টর্চ জ্বাললেন। নেহা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'আলো নিভিয়ে দিন, বাবুজী। আমি আপনার হাত ধরছি।'

অন্ধকারে প্রিয়নাথের হাত ধরল নেহা।

স্পর্শে সম্মোহন করা যায় কি না প্রিয়নাথ জানেন না। আর প্রিয়নাথের যেরকম মন এবং বয়েস তাতে কিশোরী নেহাকে নিয়ে কোনওরকম অন্যায় কল্পনা তাঁর কাছে নেহাতই হাস্যকর। কিন্তু তবুও কোন এক রহস্যময় কারণে নেহার হাত ছুঁতেই প্রিয়নাথ কেমন এক অলৌকিক ভরসা পেলেন।

আকাশ মেঘলা, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। প্রিয়নাথদের ঘিরে রেখেছে গাঢ় কুয়াশার স্তর। বেশি দূর নজর চলে না। ঠান্ডা বাতাস যেন বাতাস নয়—বরফ। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের ওপরে শাল জড়িয়েছেন। সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন শরীরে। আড়ষ্টভাবে সাবধানে পা ফেলছেন। অথচ নেহার চলা কত সহজ-স্বাভাবিক! এ-পথ নিশ্চয়ই ওর অনেক চেনা।

বেশ কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর প্রিয়নাথের সময়, দিক, সবই গুলিয়ে গেল। অকারণেই একটা ভয় তাঁর মনের ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইল। তিনি লড়াই করে সেটাকে চৌকাঠের বাইরে আটকে রাখলেন।

সেইরকম একটা মনের অবস্থাতেই তিনি চাপা গলায় নেহাকে জিগ্যেস করলেন, 'নেহা, আমার কোথায় যাচ্ছি?'

'একটু পরেই দেখতে পাবেন—' নেহা এত অস্পষ্ট গলায় কথাটা বলল যে, বেশ চেষ্টা করে ওর কথা শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর নেহা আবার কথা বলল।

'যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, বাবুজী, বহত দিন পহেলে এখানে একটা গ্রাম ছিল। সে-গাঁয়ের নাম ছিল তিনকাহানি। তিনকাহানির শেষে ছিল বড়-বড় মাঠ, খেত। তারপরে সদরিয়া। তিনকাহানি আর সদরিয়ার বর্ডারে আমরা থাকতাম...।'

থাকতাম! তার মানে!

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন। নেহার হাতটা হঠাৎই শীতের চেয়েও ঠান্ডা মনে হল।

'ভয় পাবেন না, বাবুজী।' বলেই নেহা প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওর ছায়া-শরীরটা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন আবার। পিছন ফিরে তাকালেন।

যে-তিনজন এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে ওঁদের অনুসরণ করছিল তারা কেউ নেই!

সেখানে শুধুই কুয়াশা।

প্রিয়নাথ টর্চ জ্বাললেন। সেই আলোয় কম্পাসটা বের করে দেখলেন। উত্তরমুখী কাঁটা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে!

'আলোটা নিভিয়ে দিন, বাবুজী।'

নেহারা গলা!

হতবুদ্ধি প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু চারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না।

টর্চ আর কম্পাস ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেই নেহা আবার কথা বলল।

'দাঁড়াবেন না, বাবুজী, চলুন—আমি আপনার পাশে-পাশেই আছি।'

'তোমার পিতাজী-মাজী ওঁরা কোথায় গেলেন?'

অন্ধকার ভেদ করে নেহার গলা ভেসে এল : 'ওঁরা এগিয়ে গেছেন। একটু পরে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।'

আন্দাজে ভর করে পা ফেলতে লাগলেন প্রিয়নাথ। তিনি পোড়খাওয়া মানুষ। তা সত্ত্বেও কিন্তু বেশ নাড়া খেয়ে গেছেন। সুনীতনারায়ণের বয়েস অনেক কম। ওর অবস্থাটা কী হয়েছিল তিনি সেটা মনে-মনে আঁচ করার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎই শীতটা যেন বেড়ে গেল। সামনেই দেখা গেল একটা বিশাল পুকুর। এই গাঢ় আঁধারেও জলের কোথাও-কোথাও প্রতিফলন চোখে পড়ছে। বাকি অংশটা এক অদ্ভুত কুয়াশায় ঢাকা।

পুকুরটা পেরোতেই কুয়াশা যেন ফিকে হয়ে এল। কয়েকটা ছোট-বড় গাছ চোখে পড়ল প্রিয়নাথের। গাছগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছে। অথচ বাতাস তেমন জোরে বইছে না। আর তখনই গাছের ওপরে গাঢ় আকাশে একটা নীল আভা দেখতে পেলেন প্রিয়নাথ। অনেকটা মা-কালীর গায়ের গাঢ় নীল রঙের মতো।

'নেহা—!' ডেকে উঠলেন প্রিয়নাথ।

'আমি আপনার পাশেই আছি, বাবুজী।' কেমন যেন ব্যথা পাওয়া গলায় নেহা বলল। মনে হল, ওর ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময় একটা গুনগুন শব্দ শোনা গেল। যেন অনেকে মিলে চাপা গলায় সুর করে গান গাইছে।

খুব নিচু পরদায় শুরু হয়ে সেই সমবেত 'গান' উঁচু পরদায় উঠতে শুরু করল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও প্রিয়নাথ সেই অদ্ভুত ভাষার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তবে সেই কোরাস ক্রমশ আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলছিল।

হঠাৎই সামনে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ।

দূরের মাঝারি গাছের মাঝে কোথা থেকে এসে যেন হাজির হয়েছে প্রকাণ্ড

এক মহীরুহ। তার ঝাঁকড়া মাথা থেকে ঝুরি নেমে এসেছে নীচের দিকে। কেমন অদ্ভুতভাবে হেলে গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর গাছের অন্ধকার শরীরে জোনাকির মতো জ্বলছে অসংখ্য লাল আলোর বিন্দু।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। অদ্ভুত গাছটা তাক করে শাটার টিপলেন। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটার কথা। এই সেই ফটোর রহস্য! কিন্তু এই গাছ দেখে ভয় পাওয়ার কী আছে।

ক্যামেরা ব্যাগে রাখতেই অদৃশ্য নেহার গলা শোনা গেল : 'ছবি দেখে সবকুছ মালুম হবে না, বাবুজী। আরও নজ্‌দিক চলুন—।'

সম্মোহিতের মতো এগোতে লাগলেন প্রিয়নাথ। হঠাৎই একটা বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেলেন যেন। বরফের মতো বাতাস তাঁকে ঘিরে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল। প্রিয়নাথের হাত-পা ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যেন বুঝতে পারলেন, এখানে কম্পাস বা পেন্ডুলাম বের করে কোনও লাভ নেই। তিনি এক অন্য জগতে অন্য ঠিকানায় পা রেখেছেন।

কোরাস গান এখনও বেশ জোরালো ঢঙে শোনা যাচ্ছিল। উঠছে, নামছে। যেন কয়েকশো মানুষ প্রাণপণে গলা মিলিয়ে সুর ধরেছে। সঙ্গে কোনও যন্ত্র-অনুষঙ্গ নেই।

হঠাৎই আকাশের নীল আভাটা নেমে এল সেই অলৌকিক গাছের গায়ে। আর তখনই প্রিয়নাথ—এতক্ষণ যা দেখতে পাননি তাই দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়নাথের হাত-পা অবশ হয়ে এল। ভয়ঙ্কর শীতেও কুলকুল করে ঘেমে গেলেন। ভয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না।

অসংখ্য মানুষ জড়াজড়ি করে গাছটা তৈরি করেছে। গাছের ডালপালা নিছকই ওদের হাত-পা। নেমে আসা ঝুরি ওদের হাত, হাতের বাঁকানো আঙুল, মহিলাদের লম্বা ঝুলে পড়া চুল। উল দিয়ে বোনা সোয়েটারের মতো ওরা নিজেদের শরীর দিয়ে বুনে ফেলেছে এই প্রকাণ্ড গাছ। ওদের সমবেত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে। আর হাপরের মতো ফোঁস-ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাসের ঝড় উঠছে। সেই ঝড়ে প্রিয়নাথের চাদর উড়ছে, চুল উড়ছে।

মানুষগুলোর চোখের কোটরে ভয়ঙ্কর তীব্র এক লাল আলো জ্বলছে—যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। এই চোখগুলোকেই দূর থেকে লাল আলোর বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। সুনীতের তোলা ফটোয় যেমন উঠেছে।

প্রিয়নাথ কখনও ভয়ের এত কাছাকাছি আসেননি। তাঁর শরীরের ভেতরটা কেমন করছিল। মাথা টলে যেতে চাইছিল বারবার।

কোরাস আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে

গাঢ় নীল আলোর আভা, আর তার মাঝে উজ্জ্বল লাল বিন্দুর ঝাঁক যেন অলৌকিক এক সম্মোহন।

বহুদূর থেকে ভেসে এল নেহার গলা : 'গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল, বাবুজী। তাতে তিনকাহানির সবাই খতম হয়ে গেল। সব কাহানি খতম হয়ে গেল। সে বহুত সাল পহেলে কি বাত। তারপর থেকে আমরা...ওই গাছেই একজোট হয়ে থাকি। রোজ রাতে এসে এই গাছটা আমরা তৈরি করি। দিনের বেলা আমাদের কেউ দেখতে পায় না। আর, রাতে আমরা ইচ্ছেমতন কাউকে দেখা দিই, কাউকে দিই না। মেহ্‌মানদের সেবা করতে আমরা ভালোবাসি। তাই পরদেশিবাবুদের মদদ করি, দেখা দিই। আমরা যে রাতে এখানে এসে এমন করে থাকি সে-কথা কাউকে বোলো না, বাবুজী। কিসিকো নহি বাতানা...।'

সমবেত কণ্ঠস্বর নেহার কথায় সুর মিলিয়ে ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'কিসিকো নহি বাতানা...কিসিকো নহি বাতানা...।'

সে-কথায় অলৌকিক শব্দের ঝড় বয়ে গেল যেন।

'আমি এবার ওখানে যাই, বাবুজী? আমার মাজী, পিতাজী, বড়ে ভাইয়া, সবাই ওখানে ডালপালা হয়ে আছে। আমি যাই? ফির কভি মিলেঙ্গে...।'

ফিসফিসে কোরাস আকাশ-বাতাস মাতিয়ে বলে উঠল, 'ফির কভি মিলেঙ্গে ...ফির কভি মিলেঙ্গে...।'

প্রিয়নাথ আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর দমবন্ধ হয়ে যেতে চাইছিল, কোনও ইন্দ্রিয়ই যেন আর কাজ করছিল না। সেই অবস্থায় তিনি যে কেমন করে ছুটতে শুরু করলেন কে জানে!

দিশভ্রান্ত অবস্থায় পাগলের মতো ছুটছিলেন। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। কখনও ধাক্কা খাচ্ছিলেন গাছের গুঁড়িতে। চশমা ছিটকে পড়ল কোথায়। হাতঘড়িটাও বোধহয় ভেঙে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন সদরিয়ায়।

সমস্তিপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা ফেরার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, এবার সুনীতনারায়ণকে সারিয়ে তোলার কাজটা অনেক সহজ হবে।



মনের মতো বউ

'—পাওয়া ভারি দুষ্কর।' পান চিবোতে-চিবোতে মন্তব্য করলেন বরেন মল্লিক।

'কেন, মনের মতো বউ পাওয়া দুষ্কর কেন?' চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন প্রিয়নাথ।

সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিল। সময়টা চৈত্র মাস। সামনের বৈশাখে বরেন মল্লিক তাঁর বড় ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। তাই রোজই আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পাতায় হুমড়ি খেয়ে পাত্রী খুঁজছেন। আর চেনা-জানা লোকজনকেও একটি 'ফরসা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট, গৃহকর্মে নিপুণা, বছর তেইশ-চব্বিশের সম্পন্ন ঘরের' সুপাত্রী খোঁজ করার জন্য বলেছেন।

বরেন মল্লিক আড়মোড়া ভেঙে হাতের পিঠ দিয়ে গলার ঘাম মুছে বললেন, 'এই তো একমাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছি। মনের মতো বউ পেলাম কই!'

বৃদ্ধ জগৎ শ্রীমানী খিকখিক করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বাবা বরেন, তুমি বউ খুঁজছ, না বউমা খুঁজছ?'

এ-কথায় গম্ভীর প্রকৃতির সুপ্রকাশ পালিতও হেসে ফেললেন : 'না, না, জগৎবাবু, বরেনবাবু বউমা খুঁজছেন—বউ নয়। তাই তো, বরেনবাবু?'

প্রশ্নটার ভেতরে একটা চাপা ঠাট্টা ছিল। বরেন মল্লিক সেটা সহজেই টের পেলেন। খানিকটা উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে জবাব দিলেন, 'আমি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে থাকি, রাজা নবকেষ্ট নই। দুটো বউ খোঁজার আমার মুরোদ কোথায়! আমি বলছি, ইন জেনারেল, মনের মতো বউ খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। সে নিজের বউই হোক, বা ছেলের বউই হোক।'

ভূতনাথ বললেন, 'আপনার যা চাহিদা তাতে হয়তো সুপাত্রী খুঁজে পেতে আপনাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তবে এটা জেনে রাখুন, কেউই নিখুঁত নয়। সংসার করার সময় খুঁতগুলোকে মানিয়ে নিতে হয়।'

'আপনি নিজে সংসারী না হয়েও সংসারের অনেক সিক্রেট খবর রাখেন দেখছি!'

ভূতনাথ খোঁচাটা গায়ে না মেখে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই, মল্লিকমশাই। মনে-মনে কারও যদি নিখুঁত মনের মতো বউয়ের চাহিদা থাকে, তা হলে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

'কেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন?' সুপ্রকাশ পালিতের চোখে কৌতূহল

ফুটে উঠল।

চায়ের পালা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন প্রিয়নাথ। একটু সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'আপনাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল...শুভ ব্যাপার। আর আমি যা বলব সেটা ঠিক শুভ নয়। এমনিতেই তো আমার বদনাম আছে, যে-কোনও আলোচনাতেই আমি ভূত-প্রেত-অলৌকিক এসব ব্যাপার টেনে আনি। আসলে আমি যা নিয়ে পড়াশোনা করেছি সেই সিলেবাসে শুধু এগুলোই ছিল। আর যে-ঘটনার কথা বলব বলে ভাবছি তার মধ্যেও আপনাদের অপছন্দের ওইসব ব্যাপার রয়েছে...।'

ভূতনাথের কথায় সবাই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা একটা সিলিং পাখা যথাসাধ্য জোরে ঘুরছিল। শুধু তারই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল।

প্রিয়নাথের সিগারেটের ধোঁয়া পাখার বাতাসের ঘূর্ণিপাকে এলোমেলো ছুট লাগিয়ে মিলিয়ে গেল।

জগৎ শ্রীমানী শব্দ করে শ্বাস টানলেন। বরেন মল্লিক পান চিবোনো আপাতত বন্ধ করলেন। আর সুপ্রকাশ পালিত অপেক্ষা করছিলেন। ভূতনাথের কাহিনী তাঁর কাছে মদের নেশার মতো।

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কি বউ নিয়ে?'

'বউ নিয়ে নয়—মনের মতো বউ নিয়ে।' আবার সিগারেটে টান দিলেন প্রিয়নাথ।

জগৎ শ্রীমানীর মুখ থেকে মজা মিলিয়ে গিয়েছিল। বেশ সিরিয়াস গলায় তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা কি আমরা শুনতে পারি? বরেন, তোমার নিশ্চয়ই গল্প শোনার ব্যাপারে কোন ছুচিবাই নেই?'

অন্য সবাই যখন চাইছেন তখন অ-রাজি হওয়ার কোনও মানে হয় না। মুখে অনেকটা এইরকম ভাব ফুটিয়ে বরেন মল্লিক বললেন, 'না, না, আপত্তির কী আছে!'

প্রিয়নাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য ঠিক করে, ছোট্ট করে কাশলেন। এবং বলতে শুরু করলেন।

'ভদ্রলোকের নাম, ধরা যাক, বিধানপতিবাবু। পদবি নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ওঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। ওঁর চোখের পাতা দুটো একসঙ্গে ওঠা-নামা করে না। নিজের খুশিমতো চোখের পাতা দুটো পড়ে। অর্থাৎ, আমদের চোখের পাতাজোড়া যেমন সবসময় একসঙ্গে একই ছন্দে পড়ে, ওঁরটা একেবারেই তেমন নয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সিনক্রোনাস—আর, ওঁর বেলায় অ্যাসিনক্রোনাস। ওঁর জীবনে একটা বাজে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকেই ওঁর চোখের ব্যাপারটা ওরকম হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করেছেন। পরে শরীরের এই খুঁতটুকু



মেনে নিয়েছেন।' একটু থেমে ভূতনাথ বললেন, 'অবশ্য...মানতে ওঁর বেশ কষ্ট হয়েছে। কারণ, বিধানপতিবাবু এমনিতে আগাপাস্তলা নিখুঁত মানুষ। অন্তত উনি তাই মনে করতেন। উনিও মনের মতো বউ চেয়েছিলেন...।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার।

বিধানপতিবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেললেন। বিরক্তির একটা শব্দ করে বিচ্ছিরিভাবে চেঁচিয়ে বললেন, 'চায়ে কেউ এত চিনি দেয়! চিনি তো বাজে খরচ হলই, চা-টাও মুখে দেওয়া গেল না। এরপর আবার ডায়াবেটিস হলে খরচের ফর্দ আরও লম্বা হবে। এত বছর ধরে চা করছ, চিনির আন্দাজটাও ঠিক করতে পারোনি!'

কথাগুলো এতটা চেঁচিয়ে না বললেও চলত। কারণ, বিধানবাবুর স্ত্রী শ্রীরাধা ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া রান্নাঘরে তখন রান্না চাপিয়েছেন।

শ্রীরাধা কোনও জবাব দিলেন না। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় শ্রীরাধা জেনে গেছেন স্বামীর এই ধরনের অভিযোগের সাফাই দিতে গেলে ওঁর বিরক্তি বেড়ে যায়—ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে গড়ায়। তাই ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'অখেয়ালে ভুল হয়ে গেছে।'

বিধানবাবু আরও কিছুক্ষণ চাপা গলায় গজর-গজর করলেন। মনে হল, ব্যাপারটা আরও খানিক গড়ালে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

চা খেতে-খেতে টিভি দেখছিলেন বিধানপতি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টিভির দিকে চোখ রেখেই হাত বাড়ালেন কর্ডলেস ফোনের কালো হাতলটার দিকে।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই থমকে গেলেন।

'এ কী! টেলিফোনের কভারটা এরকম উলটোপালটা করে কে রাখল!'

শ্রীরাধা রান্না ছেড়ে ব্যস্ত পায়ে চলে এলেন ডাইনিং স্পেসে : 'কেন, কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে!' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বিধানপতি, 'কভারটা কীভাবে রাখা আছে দেখেছ?'

ফোন তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে।

শ্রীরাধা নরম গলায় বললেন, 'এখুনি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি আগে ফোনটা ধরো...।'

বিধানবাবু ফোন তুলে 'হ্যালো' বললেন। ওঁর অফিসের বন্ধু সুজন ফোন করেছে। তিনি টেলিফোনে হেসে-হেসে কথা বলতে লাগলেন। অসুবিধে হওয়াতে টিভির রিমোটটা ডাইনিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে টিভির ভলিউম কমিয়ে

দিলেন। তারপর কর্ডলেস ফোনের হ্যান্ডসেট নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে টেলিফোনে কথা চালিয়ে গেলেন।

শ্রীরাধা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিলেন আবার। রান্না করতে-করতে নিজের কপালের কথা ভাবছিলেন।

শ্রীরাধার স্বামীকে দেখে অনেকেই ওঁকে হিংসে করে। কারণ, বিধানপতির চেহারা সত্যিই পুরুষের মতো। টকটকে ফরসা গায়ের রং, সুঠাম স্বাস্থ্য, সুন্দর নাক-মুখ-চোখ। বয়েস বিয়াল্লিশ হলেও দেখে মনে হয় পঁয়তিরিশ ছোঁননি।

বিধানবাবু কোনও কাজের ভার নিলে সেটা নিখুঁতভাবে শেষ করেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে ভালোবাসেন। সময় ও নিয়ম মেনে চলাফেরা করা ওঁর আদর্শ।

বিয়ের সময় বিধানপতির সবকিছুই ভালো লেগেছিল শ্রীরাধার। কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে জানতে পেরেছেন ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা অভিযোগের স্বভাব, আর খুঁটিয়ে জরিপ করে দেখতে পেয়েছেন ওঁর ফরসা কপালে তিনটে বিরক্তির ভাঁজ।

এমনিতে দোষটা হয়তো খুব মারাত্মক নয়, কিন্তু শ্রীরাধা যেন মাঝে-মাঝে হাঁফিয়ে ওঠেন। ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। শরীরটা হাঁসফাঁস করতে থাকে।

ইদানীং শ্রীরাধার ব্লাড প্রেসারও খুব মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রথমবার স্বামীকে যখন হাই প্রেসারের ব্যাপারটা আঁচ করার কথা বলেন, তখন যথেষ্ট যত্ন করে তাঁর মেডিকেল চেক-আপের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন বিধানপতি। তবে পথে যেতে-যেতে ওঁকে আলতো গলায় বলেছেন, 'তোমাদের ফ্যামিলিতে নিশ্চয়ই হাই প্রেসারের ধাত আছে। তোমারটাও হয়তো বিয়ের আগে থেকেই ছিল।'

মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীরাধা কোনও জবাব দেননি। রাস্তার মাঝে বিশ্রী তর্কে ঢুকে পড়তে ওঁর মন চাইছিল না।

এরকম ছোট-ছোট ঘটনার চাপে শ্রীরাধা দিনকে-দিন যেন কাহিল হয়ে পড়েছেন। মাথাটা সবসময় কেমন পাগল-পাগল লাগে।

এই তো, একটু আগেই যে-মানুষটা চায়ের চিনি আর টেলিফোনের কভার নিয়ে অমন বিচ্ছিরিভাবে অভিযোগ করল এখন সেই মানুষটাই টেলিফোনে দিব্যি হেসে-হেসে কথা বলছে!

মানসিক চাপে অবসন্ন হয়ে কখনও-কখনও আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন শ্রীরাধা। কিন্তু তখনই ওঁর মায়ের মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে, তার পাশে অসহায় ছোট বোনের মুখ। শ্রীরাধা আর এগোতে পারেননি।

একদিন রাতে তর্ক অনেকটা এগিয়েছিল। কারণ শ্রীরাধা ওঁর মা-হতে-না-পারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই একটা ব্যাপারে বিধানপতি কখনও কোনও অভিযোগ করেননি। শ্রীরাধার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জেদও ধরেননি। কারণ, তিনি বোধহয় ভেতরে-ভেতরে জানতেন গোলমালটা কোথায় হতে পারে। তাই

তীব্র কোণঠাসা হয়ে পড়লে শ্রীরাধা কখনও-কখনও এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ তুলে বিধানপতিকে খোঁটা দিতে চাইতেন।

এইরকম টালমাটাল দিনযাপনের মাঝে একদিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে-কাঁদতে শ্রীরাধা বলেছেন, 'তোমার এই নিত্য অভিযোগের ঠেলায় কোনদিন অফিস থেকে ফিরে দেখবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছি।'

উত্তরে বিধানপতি ঠাণ্ডা গলায় বলেছেন, 'আলমারির ওপরে রাখা আমার ওই নাইলনের দড়ির বাণ্ডিলে যেন হাত দিয়ো না! আর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পোড়ো না—পাখার ব্লেড ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তারপর তো আবার থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাটে দু-চারদিন অফিস কামাই হয়ে যাবে।'

স্বামীর এই নির্লিপ্ত উত্তরে শ্রীরাধা খুব ধাক্কা খেয়েছিলেন। তর্ক থামিয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বিধানপতির অভিযোগের স্রোত অবিরাম চলতে থাকল। সোয়েটারটা তিনদিন ধরে কাচা হচ্ছে না কেন? জুতোর কালি জায়গা মতো নেই কেন? বাথরুমের কল ঠিকমতো বন্ধ করা হয়নি কেন? সরষের তেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল কেন? ইস্তিরির তারটা ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা হয়নি কেন? ফ্রিজের গায়ে এই দাগ কোথা থেকে...। ওঁর খুঁত ধরার আর শেষ নেই!

একদিন শ্রীরাধা মাথা গরম করে বলে বসলেন, 'খুঁত তো তোমারও আছে! আমি বললেই তুমি সেটা সারিয়ে ফেলতে পারবে? আমারগুলো আমি কিন্তু চেষ্টা করলেই সারাতে পারি। হুঃ...।' শেষের শব্দটার মধ্যে এমন তীব্র এক তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা মেশানো ছিল যে, বিধানপতি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

তারপর কোনওরকমে থতিয়ে-থতিয়ে বললেন, 'আমার ডিফেক্টের ব্যাপারটা তো এখনও মেডিক্যালি কনফার্মড হয়নি! তা ছাড়া এই ডিফেক্ট কি বাইরে থেকে দেখা যায়!'

শ্রীরাধা উত্তরে বিধানপতির কানে গরম সীসে ঢেলে দিলেন। মুখে আনা যায় না এমন নোংরা ভাষায় জবাব দিলেন স্বামীকে। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'গোপন খুঁত হলেই তার সাত খুন মাপ!'

বিধানপতি এ-অপমান ভুললেন না। তাই পরদিন থেকে স্ত্রীকে কথায়-কথায় অভিযোগ আর অপমানে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শ্রীরাধার মনে হল, ওঁর শরীরের দগদগে ঘায়ের ভেতরে গরম লোহার শিক গুঁজে দিয়ে কেউ যেন খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে কিছু খুঁজছে। যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন। যা-নয়-তাই করতে মন চাইল বারবার। মায়ের মুখ, ছোট বোনের মুখ মুছে যেতে চাইল চোখের সামনে থেকে।

একদিন সন্ধের আগে অফিস থেকে ফিরে বারবার কলিং বেল বাজিয়েও বিধানপতি শ্রীরাধার কোনও সাড়া পেলেন না। তখন পকেট থেকে চাবি বের করে সদর দরজার নাইটল্যাচে গুঁজে মোচড় দিলেন। দরজা তাও খুলল না।

বিধানবাবু বেশ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, শ্রীরাধা এ-সময়ে কখনও বাইরে যায় না।

দরজায় আবার ধাক্কা দিলেন। তবুও কেউ দরজা খুলল না।

যখন বিধানবাবু ভাবছেন দরজা ভাঙার জন্য লোকজন ডাকবেন কি না, ঠিক তখনই ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিল।

শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন বিধানপতি। কিন্তু শ্রীরাধা কোনও কথা না বলে ঘুরে চলে গেল বাড়ির ভেতর দিকে।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন বিধানবাবু। তারপর শ্রীরাধার ওপরে বিরক্ত হয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। অফিসের জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করলেন।

সেখান থেকেই রান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। শুনে একটু অবাক হলেন। এত তাড়াতাড়ি তো রান্না শুরু করেন না শ্রীরাধা!

ডাইনিং স্পেসের বেসিনে হাত-মুখ ধুতে এসে বিধানপতি দেখলেন, ডাইনিং টেবিলে ধোঁয়া-ওঠা গরম চা আর তার পাশেই প্লেটে দুটো বিস্কুট। এটা ঠিকই, তিনি অফিস থেকে ফিরে এসে রোজ চা-বিস্কুট খান। কিন্তু চোখের পলকে চা তৈরি হল কেমন করে!

হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে উঁকি মেরে তিনি সে-কথাই জিগ্যেস করলেন শ্রীরাধাকে।

শ্রীরাধা একটা গোলাপী শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। স্বামীর কথায় ফিরে তাকালেন না। শুধু অস্পষ্টভাবে বললেন, 'তৈরি যখন হয়ে গেছে তখন খেয়ে নাও।'

বিধানপতি আন্দাজ করলেন, কোনও কারণে শ্রীরাধা রেগে আছেন। তাই কথা না বাড়িয়ে চা খেতে বসে গেলেন।

চায়ের কাপে দু-চার চুমুক দেওয়ার পরই হঠাৎ ওঁর মনে হল কলতলায় কাপড় কাচার শব্দ হচ্ছে। এ-বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। শ্রীরাধা রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। তা হলে কাপড় কাচছে কে!

চায়ের কাপ ফেলে রেখে উঠে পড়লেন বিধানবাবু। ভুরু কুঁচকে এগোলেন কলতলার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন একটা আকাশী শাড়ি পরে শ্রীরাধা স্বামীর জামাকাপড় কাচছেন।

বিধানবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! তুমি না এক্ষুনি গোলাপী শাড়ি পরে রান্না করছিলে!'

কলতলার মেঝেতে উবু হয়ে বসে শ্রীরাধা কাপড় কাচছিলেন। ঘাড় কাত করে তাকালেন স্বামীর দিকে। হেসে বললেন, 'রান্না তো এখনও করছি।'

বিধানপতি কেমন যেন বিমূঢ়ভাবে ছুটে এলেন ডাইনিং স্পেসে। রান্নাঘরে উঁকি মারতে সাহস পেলেন না। কিন্তু শুনতে পেলেন শ্রীরাধা কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ছেন।

কী করবেন ভাবছেন, ঠিক তখনই বিধানবাবু দোতলার ছাদে পায়ের শব্দ পেলেন। ছাদে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে এত জোরে-জোরে শব্দ হচ্ছে কেন!

পাগলের মতো ছাদে ছুটে গেলেন বিধানপতি। গিয়ে যা দেখলেন তাকে কোনও কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না।

শ্রীরাধা ভেজা জামাকাপড় তারে ছড়িয়ে ক্লিপ আঁটছেন। পরনে একটা সবুজ ছাপা শাড়ি।

হতবাক বিধানপতি বউকে জিগ্যেস করলেন, 'এর মধ্যেই তোমার কাচাকুচি হয়ে গেল! শাড়িটাই বা বদলে নিলে কখন?'

স্বামীর দিকে চেয়ে হাসলেন শ্রীরাধা : 'আকাশী শাড়ি পরে কাপড় তো এখনও কাচছি! তোমাকে খুশি করতে হলে একটা নয়—চার-চারটে শ্রীরাধা দরকার।'

'কীসব বলছ তুমি! চারটে শ্রীরাধা দরকার! তার মানে! এসব কী ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

উত্তরে তিন নম্বর শ্রীরাধা হাসলেন আবার। বললেন, 'চার নম্বর শ্রীরাধা ছাদের ওই কোণের দিকটায় আছে। ওকে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।'

তৃতীয় শ্রীরাধার কথা মতো ছাদের কোণের দিকটায় এগিয়ে গেলেন বিধানপতি। সেখানে চতুর্থ শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন। ওঁকে দেখামাত্রই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল।

এই শ্রীরাধার দেহটা অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে। গলার নলী ফাঁক হয়ে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কয়েকটা মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওঁর পরনের হালকা হলুদ শাড়িতে রক্তের বিশ্রী ছোপ। অথচ ছাদে কোথাও রক্ত নেই। কারণ, মৃতদেহের চারপাশটা কেউ সুন্দর করে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে।

সুতরাং, অভিযোগ করার মতো কিছুই পেলেন না বিধানপতি।

হঠাৎই শ্রীরাধার মৃতদেহ চোখ খুলে তাকাল বিধানবাবুর দিকে। ফ্যাকাসে ঠোঁট ফাঁক করে কথা বলল, 'ছুরিটা ধুয়ে-মুছে আলমারিতে আগের মতো সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। আলমারির চাবি আমার কোমরে গোঁজা আছে।'

বিধানপতি একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

তখন সন্ধের আঁধার গুড়ি মেরে নেমে আসছিল। বাতাস যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আশপাশের গাছ-গাছালির একটা পাতাও নড়ছিল না।

আর, তৃতীয় শ্রীরাধা তখনও কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন।

*

প্রিয়নাথ থামলেন।

ঘরে কোনও কথা নেই। আড্ডার পরিবেশ কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রায় ফিসফিসে গলায় সুপ্রকাশ পালিত জিগ্যেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

বিষণ্ণ হাসলেন প্রিয়নাথ। মাথা নিচু করে আঙুলের নখ খুঁটলেন কয়েকবার। তারপর সামান্য কেশে বললেন, 'শ্রীরাধার মৃত্যুর তদন্ত করতে পুলিশ এসেছিল। তারা বিধানপতিকে জেরা করে-করে একেবারে জেরবার করে দিল। 'পুলিশের বক্তব্য খুব পরিষ্কার ছিল। শ্রীরাধা মোটেই আত্মহত্যা করেননি। কারণ, ওইভাবে গলা কেটে দু-ফাঁক করার পর কেউ একমিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। তা ছাড়া সুইসাইডের অস্ত্রটা তো বডির কাছেই পড়ে থাকবে। ওটা তো আর ডানা মেলে আলমারিতে ঢুকে পড়তে পারে না! তার ওপর ছাদের রক্ত কে ধুয়ে-মুছে সাফ করল? ছুরিটাই বা কে ধুয়ে রাখল? আলমারিতে চাবি দিয়ে সেই চাবি শ্রীরাধার কোমরেই বা কে গুঁজে রাখল?

'বিধানবাবু পুলিশকে পুরো ঘটনাটা জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ ওঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। বাড়িতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তা হলে তৃতীয় কোনও মানুষ শ্রীরাধাকে এইরকম রহস্যময়ভাবে খুন করে চম্পট দিয়েছে—এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিধানবাবুকে ছেড়ে দিল দুটো কারণে। এক : সারা বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিধানবাবুর কোনও রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া যায়নি। দুই: ঘটনার দিন রাত ন'টা নাগাদ পাড়ার লোকজন যখন দরজা ভেঙে বিধানবাবুর বাড়িতে ঢোকে তখনও তিনি ছাদে মৃতদেহের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত পুলিশ কেসটাকে "আনসল্‌ভ্‌ড" হেডিং দিয়ে ফাইল বন্ধ করে দেয়।

'ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বিধানপতিবাবুর মাথাটা একটু-আধটু গোলমেলে হয়ে যায়। আর চোখের পাতার ওঠা-পড়া ওরকম এলোমেলো হয়ে যায়। ওঁর এই খুঁতটা কিন্তু আর গোপন নয়—বরং সবসময় সকলের চোখে পড়ে। বহু ডাক্তার এই খুঁত সারানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিধানপতি মনে করেন, এটা শ্রীরাধার অভিশাপ...।'

প্রিয়নাথ একটু থামতেই বরেন মল্লিক প্রশ্ন করলেন, 'বাকি তিনজন শ্রীরাধার কী হল?'

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রহস্যময় হেসে বললেন, 'আমি কী জানি! আপনারাই বলুন—।'

আঁধারে মায়ার খেলা

প্রিয়নাথ বসবার ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সৌজন্য দেখিয়ে হাতজোড় করে প্রিয়নাথ বললেন, 'সরি, আপনাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। আসলে এ-সময়টা আমি পুজো করি।'

'না, না—তাতে কী আছে!' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমরাই আধঘণ্টা আগে চলে এসেছি।'

ওঁরা সোফায় বসে পড়লেন আবার। প্রিয়নাথও বসলেন।

ভদ্রমহিলা খানিকটা কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি...আপনি ঠাকুর মানেন?'

হাসলেন ভূতনাথ। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে বেশ সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর লাইটার পকেটে রেখে জড়ানো গলায় বললেন, 'দুটোতেই বিশ্বাস করি, ম্যাডাম।'

'দুটো মানে?' এবার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

'বুঝে নিন—।' রহস্যময় হাসলেন ভূতনাথ।

আজ সকালে ওঁরা—মানে এই ভদ্রলোক—প্রিয়নাথকে ফোন করেছিলেন। ওঁদের বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, তাই ভূতনাথের পরামর্শ চান। রেফারেন্স হিসেবে ভদ্রলোক এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি বিজন সরকারের নাম করেছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সন্ধে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ওঁরা সাড়ে ছ'টা নাগাদ এসে পড়েছেন। প্রিয়নাথ তখন পুজো করছিলেন। রোজ সকাল-সন্ধে ঠাকুরের আসনের সামনে বসে পুজো করা ওঁর বহু বছরের অভ্যেস।

দরজা খুলে ওঁদের বসতে বলে প্রিয়নাথ আবার অসমাপ্ত পুজোয় ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর পাজামার ওপরে একটা শার্ট চাপিয়ে ওঁদের সামনে এসেছেন।

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোকের নাম প্রমথেশ নাহা, সঙ্গে ওঁর স্ত্রী মাধুরী। ওঁরা দমদম স্টেশনের কাছে ঘুঘুডাঙায় থাকেন। কিছুদিন ধরে ওঁরা ওঁদের এক বছরের মেয়েকে নিয়ে অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছেন।


সমীর সরকার

প্রিয়নাথ ওঁদের দেখছিলেন।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসী প্রমথেশের মাথায় কোঁকড়ানো চুল। তাতে কোথাও-কোথাও পাক ধরেছে। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। ফরসা কপালে দু-তিনটে ভাঁজ। গোঁফ কলপ করা। পোশাক-আশাকে উচ্চবিত্তের ছাপ। জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোন উঁকি মারছে।

মাধুরী দেখতে সাধারণ হলেও রুচিসম্মত পোশাক পরেছেন। সাজগোজ চড়া মাপের নয়। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে চকোলেট রঙের নেলপালিশের ছোঁয়া। কপালে-সিঁথিতে প্রথাগত সিঁদুর—যা আজকাল খুব কম চোখে পড়ে।

হালকা পারফিউমের গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। কিন্তু সেটা প্রমথেশ না মাধুরীর শরীর থেকে—সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারছিলেন, বাইরে ওঁরা শান্ত ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও ভেতরে-ভেতরে বেশ উদ্বিগ্ন। হয়তো মেয়েকে নিয়েই।

সিগারেটে টান দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনাদের কথা শুনছি। আগে দোকানে একটু চা বলে আসি—' উঠে দাঁড়ালেন, হেসে যোগ করলেন, 'আমার চা-পাতা ফুরিয়ে গেছে।'

প্রমথেশ হাত নেড়ে ভূতনাথকে বাধা দিলেন : 'কোনও প্রয়োজন নেই, মিস্টার জোয়ারদার। আমরা চা খেয়েই এসেছি। আপনি নিশ্চিন্তে বসুন। বসে আমাদের প্রবলেমটা কাইন্ডলি শুনুন।'

মাধুরীর চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সর্বত্র ছন্নছাড়া ছাপ। বোঝাই যায়, এ-আস্তানায় মহিলার ছোঁয়া পড়ে না। সোফা-টেবিল-চেয়ার সবই বেহাল। একপাশে দেওয়াল-তাকে গাদা-গাদা বই। সেই বইয়ের ঢল বর্ষার জলের মতো এলোমেলোভাবে নেমে এসেছে টেবিলে, সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। তারপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। বইগুলোকে বাঁচাতে মেঝেতে অবশ্য একটা পুরনো বেডশিট ভাঁজ করে পাতা আছে।

মাধুরী অবাক চোখে মাঝবয়েসী প্রিয়নাথকে দেখছিলেন। এই সাধারণ মানুষটা কি ওঁদের অসাধারণ সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারবে?

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে প্রিয়নাথ প্রমথেশবাবুকে সিগারেট অফার করতে গেলেন। কিন্তু স্মিত হেসে প্রমথেশ বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না। আমার কাছে আছে—তবে আমি আজকাল একটু কম স্মোক করছি। মাস আষ্টেক আগে আমার একটা ছোট্ট স্ট্রোক মতন হয়ে গেছে।

'যাকগে, এবার কাজের কথায় আসি। আমার কম্পিউটারের ব্যবসা আছে। "এন-কম্পিউটার" নামে একটা ব্র্যান্ডও চালু করেছি। ক্যামাক স্ট্রিটে আমার অফিস। আর ফ্যাক্টরি দমদমে—বাড়ির কাছাকাছি। রিসেন্টলি আমি সফ্‌টওয়্যার

ডেভেলাপমেন্টেও হাত দিয়েছি। আমার কোম্পানিতে সাতজন বি.ই.-বি.টেক. এন্‌জিনিয়ার কাজ করে।

'এতসব কথা বলার কারণ—আমি টেকনোলজির লোক, ভূত-প্রেতে এক ইঞ্চি বিশ্বাস আমার নেই। যে-জিনিসের অস্তিত্বই নেই তার ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তো হাস্যকর। কিন্তু...' প্রমথেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কিন্তু গত একমাস ধরে আমার ধারণাটা চিড় খেয়ে গেছে। আমি পাজ্‌ল্‌ড হয়ে গেছি।'

প্রিয়নাথ আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। পাশের ঘরের ঠাকুরের আসন থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঠুনঠুন ঘন্টি বাজিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে একটা টানা-রিকশা চলে গেল। তারপরই মালাইবরফওয়ালার সুরেলা হাঁক শোনা গেল।

'ব্যবসা দাঁড় করাতে গিয়ে আমি বিয়ে করার ব্যাপারে বেশ লেট করে ফেলেছি, মিস্টার জোয়ারদার। তাই এ-বয়েসে পৌঁছেও আমাদের একটিমাত্র ইস্যু—মাত্র এক বছরের একটি মেয়ে। নাম প্রথমা। তবে আমরা মাম্পি বলে ডাকি।

'আমাদের প্রবলেমটা মাম্পিকে নিয়েই...।' ঘরের সিলিংয়ের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে শেষ কথাটা বললেন প্রমথেশ। তারপর : 'আমাদের নিজের বাড়ি। বাবা প্রায় ন'বছর আগে এক্সপায়ার করেছেন। আর মা মারা গেছেন মাত্র মাসতিনেক আগে। বাড়িতে এখন আমরা তিনজন—আর আমার একমাত্র বোন সাবিত্রী আমাদের কাছে থাকে। সাবিত্রী উইডো। ওর হাজব্যান্ড আর্মিতে ছিল—এনকাউন্টারে বছর চারেক আগে মারা গেছে।

'আমি বিজনেসের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। মাধুরী আর সাবিত্রীই সবকিছু দেখাশোনা করে। মাম্পি ওদের দু-চোখের মণি। মাধুরী মা—ওর তো টান থাকবেই। তবে সাবিত্রীর টান বোধহয় তার চেয়েও বেশি—' আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন প্রমথেশ।

প্রিয়নাথের মনে হল না স্বামীর কথায় মাধুরী অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

একটু থেমে প্রমথেশ আবার বললেন, 'মাম্পিকে সারাটা দিন ওরা দুজনে আগলে-আগলে রাখে। কিন্তু এত আগলে রেখেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাম্পি মনে হয় কোনও বিপদে জড়িয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেও জড়িয়ে ফেলেছে।'

'এইটুকু মেয়ে আবার বিপদে জড়াবে কেমন করে!' অবাক হয়ে বললেন ভূতনাথ।

চোখ নামালেন প্রমথেশ। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন : 'এবারে তুমি বলো—আমি একটু আনইজি ফিল করছি...।'

মাধুরী একটু কেশে নিলেন, প্রিয়নাথ এবং স্বামীকে একপলক করে দেখলেন,

তারপর বেশ নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মেজর প্রবলেম হল মাম্পি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। আপনি তো জানেন, এক বছর বয়েসের বাচ্চার পক্ষে কথা বলাটা কীরকম অস্বাভাবিক। মাসখানেক আগে একদিন হঠাৎ মাম্পি কথা বলতে শুরু করে। তখন প্রায় মাঝরাত্তির। আচমকা এক অস্বস্তিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর তখনই শুনি মাম্পি কথা বলছে।'

'কার সঙ্গে?'

'প্রথমটা মনে হয়েছিল বোধহয় আপনমনে কথা বলছে। আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙাই—' ইশারায় স্বামীর দিকে দেখালেন মাধুরী : 'তারপর অন্ধকারে চুপটি করে আমরা মাম্পির কথা শুনতে থাকি। কিছুক্ষণ শোনার পর বুঝতে পারি, ও আপনমনে কথা বলছে না—কারও সঙ্গে কথা বলছে।

'একটু পরে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরের আলো জ্বেলে দিই। আলো জ্বালতেই দেখি মাম্পি চোখ বুজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ওর ঠোঁট নড়ে উঠল। ও বলল, "আলো নিভিয়ে দে—অসুবিধে হচ্ছে।" তক্ষুনি আমি আলো নিভিয়ে দিই। তার মিনিটকয়েক পর মাম্পির কথা বন্ধ হয়ে যায়। আর পরদিন সকাল থেকেই ও আবার স্বাভাবিক। সেই দু-একটা আধো-আধো কথা : মা...বা...পিচি...এইরকম। তারপর...।'

হঠাৎই পাখির ডাকের শব্দে প্রমথেশের মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

প্রমথেশ পকেট থেকে ফোন বের করে কথা বললেন। ব্যবসার কাজের ফোন। সংক্ষেপে কথা শেষ করে প্রমথেশ বললেন, 'এখন আমাকে ফোন করে ডিসটার্ব কোরো না। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি।'

প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় 'সরি' বলে সেলফোনটা বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

আগের কথার খেই ধরে মাধুরী আবার বলতে শুরু করলেন।

'তারপর—দু-চারদিন সবে কেটেছে—মাম্পি আবার ওইরকম কথা বলল। সেদিনের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল ও কারও সঙ্গে কথা বলছে। আর মাঝে-মধ্যেই প্রথমদিনের মতো তুই-তোকারি করে মন্তব্য করতে লাগল। তখনও আমরা বুঝতে পারিনি মাম্পি ঠিক কাকে তুই-তোকারি করছে—ওকে, না আমাকে। সেটা বোঝা গেল আরও কিছুদিন পর।

'একদিন রাতে ওইরকম কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ও বলল, "পিনু যে লুকিয়ে নন্দা নামে ইস্কুলের ওই দিদিমণির সঙ্গে প্রেম করে সে আমি বহু আগেই টের পেয়েছি।" এ-কথা শুনে ও একেবারে চমকে উঠল—' প্রমথেশের দিকে ইশারা করলেন মাধুরী। তারপর মাথা সামান্য হেঁট করে বললেন, 'পিনু আমার হাজব্যান্ডের ডাক নাম।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন। কয়েকবার ঘন-ঘন টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে ফেললেন। সিগারেটের টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'মাম্পি কি তা হলে ওই ঘোর-লাগা অবস্থায় আপনার শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে?'

উত্তরে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রমথেশ। বেশ হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ—ঠিকই ধরেছেন। কারণ, বয়েসকালে নন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ইয়ে—মানে, একটা অ্যাফেয়ার ছিল। মেয়েটি পাড়ার করপোরেশন স্কুলে পড়াত। একেবারেই ছেলেমানুষী ব্যাপার।' বিষণ্ণ হাসলেন প্রমথেশ : 'কী বলব বলুন। মাম্পি এই টাইপের আরও সব এমন-এমন কথা বলছে যে, মাধুরীর সঙ্গে আমার রিলেশানটাই বিষিয়ে যাচ্ছে। আপনিই বলুন, এইসব পুরনো ইস্যুর জের টেনে অশান্তি করার কোনও মানে হয়! নিজেকে আমার ভীষণ অকওয়ার্ড লাগছে। একে তো বিজনেসের টেনশান—তার ওপরে এই বাড়তি অশান্তি। বলুন তো কার ভালো লাগে!'

এ-ধরনের কথায় প্রিয়নাথ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাই লৌকিক ব্যাপার থেকে অলৌকিক প্রসঙ্গ ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

'তার মানে আপনার মায়ের প্রেতাত্মা আপনার মেয়েকে ডিসটার্ব করছে?' প্রমথেশকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথ।

'এ ছাড়া আর কী বলব বলুন! অস্বীকার করার তো কোনও পথ নেই...।'

'আপনার মা মাম্পিকে খুব ভালোবাসতেন?'

উত্তর দিলেন মাধুরী : 'প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বলতেন, "মাধুরী, ও তোমারও মেয়ে, আমারও মেয়ে। ভাগ্যচক্রে আমার নাতনি হয়ে জন্মেছে।" মাম্পিকে ছেড়ে মা একটা মিনিটও থাকতে পারতেন না। প্রায়ই বলতেন, "মায়ার টান বড় সাঙ্ঘাতিক। কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেয় না।" শেষ দিকটায় মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই এ-কথাটা আরও বেশি করে বলতেন। আর...আর মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন...।'

মাধুরী কথা শেষ না করে চুপ করে গেলেন।

'কী বলেছিলেন?' প্রিয়নাথ আগ্রহ চেপে রাখতে পারছিলেন না। শিকারের গন্ধ পাওয়া চিতাবাঘের মতো ভেতরে-ভেতরে ছটফটিয়ে উঠছিলেন।

মাধুরী আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। নীরব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন যেন : বলব, নাকি বলব না?

প্রমথেশ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তুমি বলো—আমি কিছুই মাইন্ড করব না। বাচ্চাটাকে তো যে-করে-হোক বাঁচাতে হবে!'

শাড়ির আঁচলটা সামান্য ঠিক করে নিয়ে মাধুরী বললেন, 'মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন, "মাম্পিকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখো, মাধুরী, এই মায়ার টান আমাকে কিছুতেই তোমাদের ছেড়ে যেতে দেবে না। আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...মায়ার টান আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...তোমরা দেখো...।",

মাধুরী হঠাৎই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রমথেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মাধুরী ছোট্ট একটা রঙিন রুমাল চোখে চেপে ধরে হাত তুলে স্বামীকে ব্যস্ত না হতে ইশারা করলেন।

প্রিয়নাথ আর প্রমথেশ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাধুরী চোখ মুছে সহজ হলেন। দু-একবার নাক টেনে তারপর সামান্য ধরা গলায় অনুনয় করে বললেন, 'আমাদের বাচ্চা মেয়েটাকে আপনি বাঁচান, প্রিয়নাথবাবু। অনেক আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে। আচ্ছা, আপনারা কি মাম্পির কথাবার্তা টেপ করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি—' উত্তর দিলেন প্রমথেশ, 'ঘটনাটা শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই টেপ করার চিন্তাটা আমার মাথায় আসে। তখন আমি একটা ক্যাসেটে মাম্পির কথাবার্তা টেপ করি—মানে, একটানা পারিনি—একটু স্ক্যাটার্ডভাবে টেপ করতে পেরেছি। তাতে মাম্পির দু-চারদিনের কথাবার্তার টুকরো ধরা আছে। স্ক্যাটার্ড হলেও ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। আর...আর টেপটা প্লে-ব্যাক করে শুনলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মাধুরী তো একদিন চিৎকার করে উঠেছিল।'

'মাম্পিকে আমার দেখা দরকার....ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'অফ কোর্স!' জোর দিয়ে বললেন প্রমথেশ, 'আপনি চাইলে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন—আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

একপলক ভেবে প্রিয়নাথ বললেন, 'না, এক্ষুনি হবে না। আমি বরং কাল বিকেলে আপনাদের বাড়িতে যাব। আপনি অ্যাড্রেসটা আমাকে দিয়ে যান—।'

'তার কোনও দরকার নেই। কাল পাঁচটায় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তাতে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন : 'ঠিক আছে। আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

মাধুরী চোখের ইশারায় স্বামীকে কিছু বলতে চাইছিলেন। সেটা লক্ষ করে প্রমথেশ একটু ইতস্তত করে প্রিয়নাথকে বললেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, আপনাকে কী...মানে, আপনার ফিজটা...অ্যামাউন্টটা যদি কাইন্ডলি বলেন...।'

হাসলেন প্রিয়নাথ। বললেন, 'ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদি মাম্পিকে নরমাল করে দিতে পারি তা হলে দু-হাজার টাকা দেবেন।'

প্রমথেশ প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ বললেন,

'উঁহু, পেশেন্টকে সারাতে না পারলে আমি টাকা নিই না।'

অপ্রস্তুত হাসি হাসলেন প্রমথেশ আর মাধুরী। তারপর আরও বারকয়েক অনুরোধ-অনুনয় করে উঠে পড়লেন।

ওঁদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভূতনাথ। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস ওঁর মুখ-চোখ ছুঁয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, শীত বেশ কিছুদিন হল চলে গেলেও এখনও পুরোপুরি মায়া কাটাতে পারেনি।

মায়া বড় অদ্ভুত জিনিস।

'ঠাম্মা—।'

'কী, বল।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'পাগল!' অদ্ভুত খলখল হাসি : 'তোকে ছেড়ে কখনও যেতে পারি!'

'তুমি কোথায়?'

'সোনামণি আমার, আমি তো তোর ভেতরেই আছি। তোর আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। শঙ্খ-লাগা সাপ যেমন একটা আর-একটাকে জড়িয়ে থাকে, আমি ঠিক সেরকম করে তোর আত্মাকে জড়িয়ে আছি।' আবার আকুল অট্টহাসি। যেন কেউ হেসে কুটিকুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

তারই মধ্যে শোনা গেল এক ভয়ের আর্তচিৎকার। তারপরই কান্না। কান্না-ভাঙা গলায় মাধুরী চেঁচিয়ে বললেন, 'মা! মা! আপনি মাম্পিকে ছেড়ে দিন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটাকে বাঁচান! দোহাই আপনার...।'

উত্তরে রক্ত-হিম-করা হাসি শোনা গেল। যেন বহু উঁচু জলপ্রপাত থেকে জলের বদলে রাশি-রাশি ভাঙা কাচের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন। আপনমনেই নানা কথা ভাবছিলেন তিনি। টেপের সব কথাবার্তাই মাম্পির গলায়। তবে ঠাকুমার সংলাপগুলো বলার সময় অদ্ভুত এক বুড়োটে ঢং ফুটে উঠেছে। আর হাসিটা? একটা বাচ্চা কি সত্যিই ওভাবে হাসতে পারে?

প্রিয়নাথের মুখোমুখি বসে ছিলেন প্রমথেশ আর মাধুরী—প্রমথেশ একটি সুদৃশ্য মোড়ায়, আর মাধুরী বিছানায়। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী। পরনে রঙিন শাড়ি। গায়ের রং ময়লা। বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্তিরিশ হবে। লম্বাটে মুখ, গাল সামান্য বসা, চোখের নজরে সতর্ক ভাব।

ওঁরা গেস্ট রুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। সামনের টেবিলে প্রমথেশদের

একশো ওয়াট বিপিএল টেপরেকর্ডার।

প্রিয়নাথ ওঁর ঝোলাব্যাগ নিয়ে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছেন। ঝোলাব্যাগে রয়েছে প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির তদন্তের নানারকম যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার। মাধুরী জানিয়েছেন, মাম্পি এখনও ঘুমোচ্ছে—তবে একটু পরেই উঠে পড়বে। তখন প্রিয়নাথ ওকে দেখতে পারবেন। সেইজন্যই প্রিয়নাথ শুরুতেই প্রমথেশের রেকর্ড করা ক্যাসেট শুনতে বসে গেছেন।

ক্যাসেটের প্রথম অংশটা শোনার পর প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন।

ব্যাপারটাকে কি 'ভূতে ধরা' গোছের বলা যায়? ইংরেজিতে এ-ধরনের ব্যাপারকে 'পোল্টারগাইস্ট ফেনোমেনন' বলে। মাম্পির ঠাকুমা তো মাম্পিকে খুব ভালোবাসতেন। তা হলে বাচ্চাটাকে তিনি এ-ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এমন কি হতে পারে যে, বাচ্চাটার কষ্ট তিনি বুঝতে পারছেন না! তা নইলে বাচ্চাটার আত্মার সঙ্গে নিজের প্রেতাত্মাকে তিনি কেন জড়িয়ে রাখতে চাইছেন?

'আপনার মায়ের কোনও ফটো থাকলে আমাকে দিন।' প্রমথেশকে লক্ষ করে বললেন ভূতনাথ।

প্রমথেশ তাকালেন সাবিত্রীর দিকে : 'সাবি, বেডরুমের বড় বাঁধানো ফটোটা নিয়ে আয়।'

সাবিত্রী চলে গেলেন।

এবং ফিরে এলেন একটু পরেই। হাতে প্রমাণ মাপের বাঁধানো একটা ফটো।

ফটোটা টেবিলে ঠিং করে নামিয়ে রাখতেই ভূতনাথের সেদিকে চোখ গেল। তিনি যেন সম্মোহিতের মতো ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফটোর নীচে নাম লেখা : নয়নপ্রভা নাহা। আর তার দু-পাশে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ।

বছর সত্তর-বাহাত্তরের এক বৃদ্ধা উজ্জ্বল চোখে প্রিয়নাথকে দেখছেন। তাঁর মাথায় শোনপাপড়ির মতো ধবধবে সাদা অঢেল চুল। ফরসা কপালে বাঁদিকে একটা কালো আঁচিলের মতন। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

সব মিলিয়ে বৃদ্ধাকে কেমন যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

ঝোলাব্যাগ থেকে আতসকাচটা বের করে ফটোটার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে আতসকাচটা ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, 'এই ফটোটা আপনাদের বেডরুমে থাকে?'

মাধুরী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

প্রিয়নাথ ফটোটা সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আবার জায়গামতো টাঙিয়ে দিন।'

সাবিত্রী ফটো নিয়ে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের কোনও ঘর থেকে বাচ্চার কান্না ভেসে এল।

মাধুরী উঠে দাঁড়ালেন : 'আমি যাই। মাম্পি উঠে পড়েছে। ওকে খাওয়াতে হবে।'

মাধুরী চলে যেতেই প্রিয়নাথ আবার টেপ চালু করলেন। কিছুক্ষণ খালি টেপ চলার ঘসঘস শব্দ হল। তারপরই মাম্পির গলা পাওয়া গেল।

'ঠাম্মা, ঠাম্মা, তুমি কী করছিলে?'

'অন্ধকারে একা-দোকা খেলছিলাম।'

'কার সঙ্গে?'

'তুই চিনবি না—অন্ধকার-অন্ধকার সব লোকজনের সঙ্গে।'

'আমি মায়ের সঙ্গে খেলা করি।'

'তোর মা বাজে।'

'কেন?'

'তোর বাবাকে নিয়ে সবসময় দরজা বন্ধ করে দেয়। ভাবে আমি কিছু বুঝি না! আমার দিকে কোনও খেয়াল নেই, শুধু নিজেদের ফুর্তি! দিন-রাত শুধু ওই নিয়েই ব্যস্ত। পিনুকে আমি চিনি না! ওর জীবনে অনেক নোংরা-নোংরা ব্যাপার আছে। সেই যে ওই স্কুলের দিদিমণি...।'

'না, আমার মা-বাবা ভালো।'

'মোটেই না! তোমার মা-বাবা বাজে, বাজে, বাজে! তোমার ঠাম্মা খুব ভালো। সোনামণি লক্ষ্মীটি আমার। তোমার ঠাম্মা খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো...।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঠাম্মা ভালো। মা বাজে। বাবা বাজে। পিসি বাজে। সবাই বাজে। শুধু ঠাম্মা ভালো।'

'ভালো...ভালো...ভালো।'

তারপরই মাম্পির গলায় কান্না শোনা গেল। তবে শুনে মনে হচ্ছিল, কোনও বৃদ্ধা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তারপর সব চুপচাপ।

প্রমথেশ মাথা নিচু করে বসেছিলেন। প্রিয়নাথ টেপ বন্ধ করে বললেন, 'আরও যে রেকর্ড করেছেন সেসব কথাবার্তা কী টাইপের?'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত উলটে প্রমথেশ বললেন, 'ওই একই টাইপের। ছল-ছুতো পেলেই আমাকে আর মাধুরীকে অপদস্থ করার চেষ্টা। অথচ বিশ্বাস করুন, মায়ের জন্যে আমরা কী না করেছি!'

প্রিয়নাথ হাত নেড়ে প্রমথেশকে শান্ত করতে চাইলেন : 'আত্মা আর প্রেতাত্মায় অনেক তফাত আছে, প্রমথেশবাবু। কেউ লোক ভালো হলেই তার প্রেতাত্মা ভালো হয় না। এরকম বহু গরমিল আমি দেখেছি। আপনার মায়ের

প্রেতাত্মা কিন্তু আপনার মা নন—এটা মনে রাখবেন।' টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে ক্যাসেটটা বের করলেন : 'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেব। এবারে চলুন, মাম্পির সঙ্গে একটু দেখা করি—।'

প্রমথেশদের বেডরুমের দরজায় পা দিয়েই প্রথমাকে এই প্রথম দেখলেন প্রিয়নাথ।

বিছানার ওপরে মায়ের কোলে বসে ছিল মাম্পি। পশ্চিমের জানলা দিয়ে অবাধ্য ভাবে ঢুকে পড়া মরণাপন্ন সূর্যের কমলা রং ওর মুখে-গালে-মাথায় মাখামাখি। ওর মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ, আর ফুলো-ফুলো গাল যে-কোনও রত্নাকরকে পলকে বাল্মীকি করে দিতে পারে। এক বছরের এই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে প্রিয়নাথ তক্ষুনি ওর প্রেমে পড়ে গেলেন। এই মেয়েটির আত্মার সঙ্গে ওর ঠাকুমার প্রেতাত্মা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে এ-কথা ভাবলেই কেমন গা শিরশির করে ওঠে। সন্ধ্যা ছুঁই-ছুঁই গোধূলির আলোয় প্রিয়নাথ হঠাৎই শিউরে উঠলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে মাম্পিকে আদর করে ডাকলেন, 'মাম্পি সোনা ...মাম্পি...প্রথমা...।'

বাচ্চাটা মায়ের কোলে বসে-বসেই ঘাড় ফেরাল প্রিয়নাথের দিকে। আর ঠিক তখনই ওর মাথায় একটা অদ্ভুত জিনিস প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। সূর্যের আলো মরে এলেও ভূতনাথের দেখতে কোনও ভুল হল না।

মাধুরীকে ইশারা করে তিনি মেয়েটাকে কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মাধুরী বসে-বসেই মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে এলেন বিছানার কিনারায়।

প্রিয়নাথ বাচ্চাটার মাথা বেশ ভালো করে দেখলেন।

না, তিনি ভুল দেখেননি। মাম্পির মাথায় দু-গাছা শনের মতো সাদা চুল চিকচিক করছে। এরকম লম্বা সাদা চুল ওর মাথায় কেমন করে এল!

'ওর মাথার এই পাকা চুল দুটো আপনারা খেয়াল করেননি?'

প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী মেয়ের মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। প্রমথেশ আর সাবিত্রী তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে এলেন মাম্পির কাছে। ওঁরা তিনজনে অবাক হয়ে লম্বা সাদা চুল দুটো দেখতে লাগলেন।

মাধুরী ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'কখন এই চুল দুটো এল!'

তারপর সবাই চুপচাপ। শুধু মাম্পি হাত-পা নেড়ে অর্থহীন সব শব্দ করছিল।

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছিল। সাবিত্রী আলো জ্বেলে দিলেন। ঠিক তখনই ঘরের ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি মিষ্টি শব্দ করে জানিয়ে দিল ছ'টা বাজে।

মাম্পির তিনজন অভিভাবক ফ্যাকাসে মুখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। প্রিয়নাথের চোখ একবার মাম্পিকে দেখছিল,

আর-একবার দেওয়ালে টাঙানো নয়নপ্রভার ফটোর দিকে দেখছিল। বৃদ্ধা কি চাইছেন তাঁর শরীরের ছায়া মাম্পির ওপরে পড়ুক? দু-গাছা সাদা চুল দিয়েই কি তার শুরু?

সাবিত্রী প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'কী হবে এখন!'

প্রিয়নাথ যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আজ রাতেই একবার চেষ্টা করে দেখি...।'

মাধুরী প্রিয়নাথকে জিগ্যেস করলেন, 'পাকা চুল দুটো তুলে দেব?'

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'না, না—একদম না। আমাদের কপাল ভালো হলে ওগুলো নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন মাম্পির সঙ্গে। ওকে আদর করলেন, ওর সঙ্গে কথা বললেন।

ওঁরা তিনজন ভূতনাথের এই আচরণে একটু অবাক হলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ আসলে নিজের ভেতরের টেনশানটা কাটাতে চেষ্টা করছিলেন।

একটু পরে তিনি বললেন, 'আজ রাতে আমরা সবাই এ-ঘরে থাকব। একটা টেবিল আর চারটে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। তারপর আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

প্রমথেশ সাবিত্রীকে বললেন সব ব্যবস্থা করতে।

এমন সময় বেডরুমের দেওয়াল-তাকে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। প্রমথেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন, কথা বললেন।

প্রিয়নাথ মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, 'মারা যাওয়ার পর নয়নপ্রভাকে আপনারা কখনও দেখেছেন?'

মাধুরী মাম্পিকে মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন।

প্রমথেশের কথা বলা হয়ে গিয়েছিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'একবারই মাত্র দেখেছিলাম। দিন দশ-বারো আগে মাঝ রাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কিছুতেই আর ঘুম আসছিল না। তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎই মাকে দেখতে পেলাম। সাদা থান পরা একটা ছায়া যেন অন্ধকারে শূন্যে ভাসছে। তবে স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। একটা কালো রঙের বিশাল ফ্যানের ব্লেড যেন মায়ের সামনে ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। তার আড়াল দিয়ে আমি মাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মায়ের ধবধবে সাদা চুল বাতাসে উড়ছিল। হঠাৎই মা দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিল—যেন কোনও বাচ্চাকে কোলে নিতে চাইছে। তারপরই ছবিটা মিলিয়ে গেল। সেটাও বেশ পিকিউলিয়ারভাবে। যেন পাউডার দিয়ে কেউ মায়ের ছবিটা তৈরি করেছিল। হঠাৎ করে জোরে ফুঁ দিয়ে পাউডারের গুঁড়োগুলো উড়িয়ে দিল বাতাসে।'

প্রমথেশ থামলেন।

মাম্পি টলোমলো পায়ে মেঝেতে হাঁটতে চেষ্টা করছিল। থেকে-থেকেই মায়ের শাড়ি খামচে ধরছিল।

প্রিয়নাথ অবাক চোখে বাচ্চাটাকে দেখছিলেন। ওকে নিয়েই যত গোলমাল যত কাণ্ড—অথচ ওর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই।

সাবিত্রী কাজের লোকদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। টেবিল-চেয়ার ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার চা আর স্ন্যাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। সেগুলো টেবিলে রেখে প্রমথেশকে লক্ষ করে বললেন, 'দাদা, তোমরা চা খেতে-খেতে কথা বলো।' তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে : 'আপনি আজ আমাদের এখানে খাবেন—আর রাতে তো থাকছেনই। গেস্ট-রুমে আপনার শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

প্রমথেশ হেসে বললেন, 'শুধু আজ কেন! যদি দরকার মনে করেন তা হলে পাঁচ-সাত-দিনও থাকতে পারেন। উই ডোন্ট মাইন্ড অ্যাট অল।'

প্রিয়নাথ বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, 'কে জানে, ব্যাপারটা আজ রাতে মিটবে কি না!'

সাবিত্রী বোধহয় রান্নাবান্নার তদারকি করতে চলে গেলেন। মাধুরী ওঁকে বললেন, 'তুমি যাও, আমি একটু কথা বলেই যাচ্ছি—।'

চা খেতে-খেতে নয়নপ্রভা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন মাধুরী আর প্রমথেশ। প্রিয়নাথ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। ঝোলাব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে মাঝে-মাঝে নোট নিলেন। তারপর চায়ের পাট চুকলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'চলুন, নয়নপ্রভাদেবীর ঘরটা একবার দেখে আসি।'

প্রমথেশ মাধুরীর দিকে তাকালেন।

মাধুরী বললেন, 'মা সাবিত্রীর সঙ্গে থাকতেন। মা চলে যাওয়ার পর ও-ঘরে সাবিত্রীই একা থাকে। ওখানে তো মায়ের চিহ্ন বলতে সেরকম কিছু নেই—শুধু পুরনো আমলের একটা কাঠের আলমারি ছাড়া...।'

প্রিয়নাথ তবু যেতে চাইলেন।

মাধুরী স্বামীকে বললেন, 'তুমি মাম্পিকে দেখো—আমি ওঁকে ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসছি।'

মাধুরী প্রিয়নাথকে নিয়ে চলে গেলেন সাবিত্রীর ঘরের দিকে।

কিন্তু সেখানে প্রিয়নাথকে হতাশ হতে হল। মনে দাগ কাটার মতো নতুন কিছুই চোখে পড়ল না।

সুতরাং একটু পরেই ওঁরা দুজনে ফিরে এলেন। প্রমথেশ মাম্পিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয়নাথ ফিরে আসামাত্রই জানতে চাইলেন, 'কিছু পেলেন?'

প্রিয়নাথ সিগারেটে আলতো টান দিয়ে বললেন, 'নাঃ...।' তারপর মাম্পির কাছে এগিয়ে এসে ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'আজ রাত দশটা নাগাদ আমরা ওই টেবিল ঘিরে বসব। মাধুরীদেবী,' মাধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন ভূতনাথ, 'আপনার শাশুড়ির ছবিটা আমি দেওয়াল থেকে নামাচ্ছি। ওটা টেবিলে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখব। ওঁর ওপরে কনসেন্ট্রেট করার জন্যে ছবিটা দরকার।'

ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলেন প্রিয়নাথ। বৃদ্ধার তীব্র চোখ প্রিয়নাথকে যেন বিদ্ধ করল।

কয়েক ঘণ্টা পর অন্ধকারে বসেও প্রিয়নাথকে বৃদ্ধার তীব্র দৃষ্টির চাপ সহ্য করতে হচ্ছিল। কারণ, টেবিলে দাঁড় করানো ছবির ওপরে প্রিয়নাথের টর্চ একটা আলোর বৃত্ত এঁকে দিয়েছিল। আর ওঁরা চারজন হাতে হাত ধরে একমনে নয়নপ্রভার কথা ভাবছিলেন।

অন্ধকারে ওঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে মরা চাঁদের আলো আর বাতাস ঢুকে পড়ছিল ঘরের ভেতরে।

টেবিল ঘিরে বসার আগে প্রিয়নাথ কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাধুরী, প্রমথেশ ও সাবিত্রীকে।

'আমি যা বলব সেটা অক্ষরে-অক্ষরে মানতে হবে। এর যেন একফোঁটা নড়চড় না হয়। কেউ কোনও কথা বলবেন না, বা আন্‌নেসেসারি কোনও আওয়াজ করবেন না। আর সবাই একমনে নয়নপ্রভার কথা ভাববেন—যেন উনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। যদি আচমকা নয়নপ্রভার প্রেত-শরীর ঘরে দেখা দেয় তা হলে আপনারা যেন ভয় পেয়ে চিৎকার-টিৎকার করবেন না। তাতে কাজের অসুবিধে হবে। আর লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ইনস্ট্রাকশন হল : কোনও অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে কেউ উঠবেন না।'

কথাগুলো বলার সময় প্রিয়নাথকে কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ দেখা নিপাট ভদ্রলোক-ভদ্রলোক চেহারাটা বদলে গিয়ে জেগে উঠল আত্মবিশ্বাসে টগবগ করা প্রেতসিদ্ধ এক নিষ্ঠুর মানুষ।

মাধুরীর কেমন ভয়-ভয় করছিল। চেয়ারে বসে বারবার চোখ ফেরাচ্ছিলেন বিছানার দিকে। মাম্পি সেখানে অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওকে অন্য ঘরে রেখে আসতে চেয়েছিলেন মাধুরী, কিন্তু প্রিয়নাথ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, 'মাম্পি এই ঘরে না থাকলে প্রেতচক্র বসানোর কোনও মানেই হয় না।'

সাবিত্রীও ভয় পাচ্ছিলেন। তবে যা কিছু করা হচ্ছে সবই মাম্পির ভালোর

জন্য—এই বলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন।

প্রমথেশের মনে খানিকটা আশঙ্কা যে ছিল না তা নয়। তবে তার চেয়ে বেশি হচ্ছিল কৌতূহল। তাঁর যুক্তিবাদী মন অবাক কৌতূহল নিয়ে বিচিত্র মানুষটার বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল।

ইলেকট্রনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির শব্দে অসুবিধে হবে বলে ঘড়ির ব্যাটারিগুলো খুলে রাখতে চেয়েছিলেন প্রিয়নাথ। তখন প্রমথেশ বলেছেন, তার দরকার নেই। কারণ, ঘড়ির ঘণ্টার শব্দটা লাইট অ্যাক্টিভেটেড। ঘরের আলো জ্বললে ঘণ্টা বাজে, নইলে নয়।

ঝোলাব্যাগ হাতড়ে দুটো মোমবাতি বের করে ঘরের এক কোণে সে-দুটো জ্বেলে দিলেন প্রিয়নাথ। একটা খড়ির ডেলা বের করে টেবিলে একটা ত্রিভুজ এঁকে সেই ত্রিভুজের মাঝখানে একটা বড়সড় কড়ি বসিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিলেন।

আবছা আঁধারে চেয়ারে এসে বসলেন প্রিয়নাথ। ঝোলাব্যাগ থেকে একটা সরু টর্চ বের করে জ্বাললেন। জ্বলন্ত টর্চটা টেবিলে এমনভাবে রাখলেন যাতে আলোর বৃত্তটা সরাসরি নয়নপ্রভার মুখের ওপরে গিয়ে পড়ে। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়াতে শুরু করলেন।

মন্ত্র পড়া শেষ হলে প্রিয়নাথ চাপা গলায় বললেন, 'স্টার্ট। আর কেউ কোনও কথা বলবেন না।'

অন্ধকারে প্রেতচক্র শুরু হল।

চুপচাপ বসে নয়নপ্রভার কথা ভাবতে-ভাবতে সময়ের হিসেব যখন গুলিয়ে গেছে ঠিক তখনই একটা শব্দ হল। তারপর আবার...আবার।

টেবিলের ওপরে রাখা কড়িটা নড়ছে।

সবার কেমন শীত-শীত করে উঠল। প্রিয়নাথ থার্মোমিটার না দেখেই বুঝলেন ঘরের উষ্ণতা কমছে। সেইসঙ্গে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাসও কেমন যেন উদ্দাম মাতাল হয়ে উঠল।

হঠাৎই মাম্পি কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথের বাঁদিকে বসেছিলেন মাধুরী। প্রিয়নাথ টের পেলেন, ওঁর হাত কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে।

আরও কয়েকবার কাঁদল মাম্পি। তারপর বড়দের মতো গলায় বলে উঠল, 'পিনু, তোরা কী চাস?'

প্রিয়নাথের ডানদিকে বসা প্রমথেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে প্রিয়নাথ ওঁর হাতে চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে টর্চটা নিভে গেল।

এতক্ষণ একটা আলোর আভা আবছাভাবে ঘরময় ছড়িয়ে ছিল। এখন সেই

আলোকে ঝাঁট দিয়ে কেউ যেন জড়ো করে দিল মোমবাতিগুলোর কাছে।

প্রশ্নটা ভেসে এল আবার : 'তোরা কী চাস?'

এবার জবাব দিলেন ভূতনাথ, 'মাম্পিকে ফেরত চাই।'

'তুই কে?' মাম্পির গলায় যেন সন্দেহের বিষ ঝরে পড়ল।

'আমি ভূতনাথ। মাম্পিকে ফেরত নিতে এসেছি।' বজ্রস্বরে বললেন প্রিয়নাথ।

'আ-হা! আহ্লাদ!' ব্যঙ্গ করে উঠল কণ্ঠস্বর। তারপই শুরু হল খলখল হাসি।

প্রিয়নাথ বিছানায় শোয়া মাম্পির দিকে দেখলেন। বাচ্চাটা নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মাধুরী আর কান্না চাপতে পারছিলেন না। সাবিত্রী থরথর করে কাঁপছিলেন।

হাসি থামলে পর শোনা গেল : 'মাম্পিকে আমি ছাড়তে পারব না—ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। মায়ার টান কি সহজে কাটানো যায়!'

আচমকা প্রিয়নাথ মাধুরী আর প্রমথেশের হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'মাম্পি মানুষ—আর তুই পিশাচ। পিশাচের আবার মায়ার টান কীসের! তোর টানে মাম্পি খতম হয়ে যাবে। মাম্পিকে তুই ছেড়ে দে!'

'আ-হা! ছেড়ে দে বললেই হল!' ব্যঙ্গের ধারালো টান ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে। তারপর একটু হেসে : 'পিনু, এই লোকটাকে বাড়ি থেকে বের করে দে!'

প্রমথেশ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কাতর গলায় বলে উঠলেন, 'মা, তোমার জন্যে আমরা শেষ হয়ে গেলাম...আমরা সব্বাই শেষ হয়ে গেলাম...।'

মাধুরী এবার জোরে কেঁদে উঠলেন।

'মায়ার টান রে, মায়ার টান! আমি কী করি বল!' প্রেত-কণ্ঠস্বর স্নেহ-মাখা গলায় বলল।

প্রিয়নাথ হাত-পা ছুড়ে প্রায় উন্মত্তের মতো লাফিয়ে উঠলেন। ওঁর শরীরের ধাক্কায় চেয়ারটা পিছনে উলটে পড়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে হাড় কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল। ঘরের উষ্ণতা পলকে আরও কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল।

প্রিয়নাথ ছুটে গেলেন বিছানার কাছে। সবাইকে অবাক করে ঘুমন্ত মাম্পিকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘরের সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'তোর মায়ার টানে ফুলের মতো এই শিশুটা দিনকে-দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুই ওকে ছেড়ে দে! ছাড়তে তোকে হবেই! নইলে তোর নিস্তার নেই!'

প্রিয়নাথের গর্জনে মাম্পির ঘুম ভাঙল না। তবে মাধুরী আর সাবিত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমন্ত মাম্পি খলখল করে হেসে উঠল। কানের ঠিক পাশেই হঠাৎ ওরকম হাসির শব্দ হওয়ায় ভূতনাথ চমকে উঠলেন।

আর তখনই বটগাছের ঝুরির মতো অসংখ্য ধবধবে সাদা চুল নেমে এল ঘরের

সিলিং থেকে। ঘূর্ণি বাতাসে শনের মতো সেই চুল এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। কোথা থেকে এক অলৌকিক আলো ছড়িয়ে পড়ল ভেসে বেড়ানো সেই চুলের ওপরে। সেখানে রামধনুর সাত রং খেলে বেড়াতে লাগল।

চুলের তন্তুজালে প্রিয়নাথ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এক হাতে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে রেখে অন্য হাতে মুখে-চোখে ঢলে পড়া সাদা চুলগুলো সরাতে চাইলেন।

মাধুরী, সাবিত্রী আর প্রমথেশ—ওঁরা তিনজনে তখন আতঙ্কে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। অন্ধকারে চুলের মায়াজালে দিশেহারা হয়ে ওঁরা যেখানে-সেখানে ধাক্কা খেতে লাগলেন। মাধুরী আর সাবিত্রী ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন বারবার। আর তারই মধ্যে মাম্পির নাম ধরে ডাকছিলেন।

প্রমথেশ দম-বন্ধ-করা গলায় ডেকে উঠলেন, 'মিস্টার জোয়ারদার! প্রিয়নাথবাবু!'

প্রিয়নাথ তখন রাগে পাগল হয়ে গেছেন। এক প্রেতের সঙ্গে এক প্রেতসিদ্ধের চ্যালেঞ্জ যেন চকমকি পাথরের ঠোকাঠুকি....তা থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুলকি।

কয়েক লাফে প্রিয়নাথ ছিটকে চলে এলেন প্রেতচক্রের টেবিলের কাছে। মাম্পিকে টেবিলে শুইয়ে দিলেন। ঝোলাব্যাগ হাতড়ে বের করে নিলেন একটা মাঝারি মাপের ছুরি। তারপর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে বাঁ হাতে মাম্পির চুলের মুঠি ধরে ছুরিটা ছোঁয়ালেন ওর গলার কাছে।

হিংস্র বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন প্রিয়নাথ, 'তুই যখন ওকে ছাড়বি না, তখন আমিই ওকে শেষ করে দেব!'

মাধুরী ছুটে এলেন প্রিয়নাথের কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর হাত চেপে ধরতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিলেন মাধুরীকে। ভয়ঙ্কর গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'তোর হাতে তিলতিল করে মরার চেয়ে এ অনেক ভালো। এই দ্যাখ, তোর আদরের মাম্পিকে আমি খতম করে দিচ্ছি!'

মাম্পি এতক্ষণ অসাড়-অচেতন ছিল। হঠাৎই ওর মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল।

প্রেত কণ্ঠস্বর কাঁদছে।

'না! না! ওকে মারিস না। আমি ওকে বড় ভালোবাসি...ওকে মারিস না...।'

'তুই যদি সত্যিই ওকে ভালোবাসিস তা হলে এই মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দে! তোর মায়ার টানে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে...।'

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শোনা গেল। সাত রঙের আভায় রঙিন চুলের ঢল ভেসে বেড়াতে লাগল ঘরের বাতাসে। বাতাস আরও কয়েক গুণ হিম হয়ে গেল যেন।

ইনিয়েবিনিয়ে কান্নার মাঝেই শোনা গেল : 'আমি চলে যাচ্ছি...আমি চলে যাচ্ছি...।'

আর ঠিক তখনই নয়নপ্রভার বাঁধানো ফটোটা টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙে গেল।

সাবিত্রী চিৎকার করে উঠেই টাল খেয়ে পড়ে গেলেন। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, চুলের ঢল ক্রমে আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের উষ্ণতা বেড়ে উঠছে আবার।

ঘরের দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছিল, কিন্তু সে-শব্দ এতক্ষণ কারও কানে যায়নি।

মাম্পি হঠাৎই যেন ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। তবে এ-কান্না কোনও বাচ্চার স্বাভাবিক কান্না।

প্রিয়নাথ ছুরিটা ফেলে দিলেন। মাম্পিকে তুলে নিয়ে মাধুরীর কোলে দিলেন।

মোমবাতির অদ্ভুত আলোয় ওঁদের ছায়া-শরীরগুলো নড়ে বেড়াচ্ছিল।

মাধুরী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মাম্পিকে তিনি অনেক আদরের কথা বলছিলেন কিন্তু কান্না মিশে গিয়ে কথাগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

অবসন্ন ভূতনাথ ঘরের মেঝেতে বসে পড়লেন। ক্লান্ত ভাঙা গলায় বললেন, 'প্রমথেশবাবু, আলো জ্বেলে দিন। আর দরজাটা খুলে দিন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।'

হতভম্ব প্রমথেশ শিথিলভাবে হেঁটে গেলেন আলোর সুইচের কাছে।

তিনি আলো জ্বালতেই প্রিয়নাথের চোখ গেল মেঝেতে পড়ে থাকা নয়নপ্রভার ছবির দিকে। সেটা দেখিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'এ-ছবিটা নষ্ট করে ফেলবেন। ওঁর কোনও ছবি বাড়িতে না রাখাই ভালো। আশা করি মাম্পিকে আর কখনও উনি বিরক্ত করবেন না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ। ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে আবার বললেন, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।'



সামান্য কুয়াশা ছিল

আগাম কোনও খবর না দিয়েই বর্ষা এবার সময়ের আগেই হাজির। আর শুধু হাজির নয়, ইনিংসের প্রথম বল থেকেই একেবারে ঝোড়ো ইনিংসে খেলতে শুরু করেছে। যেমনই বৃষ্টির জোর তেমনই হাওয়ার দাপট। শুরুতে অবশ্য এতটা বোঝা যায়নি। বিকেল পড়ে আসার আগেই সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় সকলে এসে পড়েছেন—জগৎ শ্রীমানী, বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার। আজ ওঁরা অন্যদিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন। কারণ, আজ শোকসভা। ওঁরা এসে পৌঁছনোর কিছুটা পরে শুরু হয়েছে ঝড় আর বৃষ্টির ঘটা।

ওঁরা পাঁচজন নিচু গলায় কথা বলছিলেন। ওঁদের কথাবার্তায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ সুর মাখানো ছিল। আর একইসঙ্গে সদ্য-চলে-যাওয়া মানুষটার নানান স্মৃতি ওঁদের মনে অস্থিরভাবে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

তিনদিন আগে এ-পাড়ার ডাকসাইটে উকিল বাসুদেব ভদ্র হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ওঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। কিন্তু শরীর জবরদস্ত ছিল। রোজ ভোর পাঁচটায় শিরদাঁড়া টান-টান করে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। ওকালতিতে অসম্ভব দাপট ছিল, জজসাহেবরাও তটস্থ হয়ে থাকতেন। বাসুদেববাবুর সঙ্গে পাড়ার অনেকেরই হৃদ্যতা ছিল। ওঁর আচমকা চলে যাওয়ায় অনেকেই কম-বেশি ধাক্কা খেয়েছেন। কেউ-কেউ আবার যেন ভগবানের অদৃশ্য নোটিশ দেখতে পেয়েছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে বাসুদেব ভদ্রর বয়েসের তফাত থাকলেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা ছাড়া সুপ্রকাশবাবুদের রাঁচির জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে বাসুদেববাবু মামলাও লড়েছিলেন। সেইজন্যই সুপ্রকাশবাবু নিজে উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে খবর দিয়ে একটা ঘরোয়া স্মরণসভা গোছের আয়োজন করেছেন।

সুপ্রকাশ বাসুদেব ভদ্র সম্পর্কে নানা কথা বলছিলেন। অন্য চারজন একমনে ওঁর কথা শুনছিলেন। মাঝে-মাঝে সুপ্রকাশ থামলে অন্যরা নিজেদের দু-একটা মন্তব্য করছিলেন।

বরেন মল্লিক বললেন, 'বাসুদেবদা খুব মিশুকে ছিলেন। আমার লন্ড্রিতে যখনই যেতেন প্রাণ খুলে গল্প করতেন।'

বৈঠকখানার একটা জানলা খোলা ছিল। সেটা দিয়ে ঠিক টিভির সিনেমার


সমীর সরকার

মতো বাইরের ঝড়বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিল। ঝোড়ো বাতাস হঠাৎই বেশ বেড়ে গেল। শনশন হাওয়া কাটার শব্দ উঠল বাইরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। সেটা লক্ষ করে সুপ্রকাশ পালিত বিজন সরকারকে বললেন, 'জানলাটা একটু বন্ধ করে দিন না...।'

বিজন সরকার এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। বেশিরভাগ সময়েই খোশমেজাজে থাকেন। তবে এখন নিষ্প্রভ মুখে বসে আছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের কথায় হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা দুটো ভেতর থেকে এঁটে দিলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ভদ্রবাবুর পদবির সঙ্গে তাঁর ক্যারেক্টারের দারুণ মিল ছিল। পাড়ার ব্যাপারে কখনও আমাকে খালি হাতে ফেরাননি।'

হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, 'বাসুদেবটা মারা যাওয়ার সময়েও ওকালতি প্যাঁচ কষে গেল......।'

সকলে অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি যোগ করলেন, '.....আমাকে সমন ধরিয়ে দিয়ে গেল। জানিয়ে দিল, আমার ওভারটাইম চলছে।'

'না, না—ও-কথা বলছেন কেন!' সুপ্রকাশ পালিত সামাল দেওয়ার সুরে জগৎবাবুকে লক্ষ করে বললেন। তারপর কাচের শার্সি আঁটা জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যোগ করলেন, 'এরকম জোর বর্ষা এবারে এই প্রথম নামল। চার-ছ'ঘণ্টার মধ্যে থামবে বলে মনে হয় না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুপ্রকাশ। শার্সির গা বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামছিল। সেই রেখার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আমাদের জীবনটাও যেন কাচের গায়ে জলের রেখার মতন। মাধ্যাকর্ষণের মতো কোনও একটা টানে কিছুক্ষণ এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা। তারপর—তারপর সব শেষ। কী বলো, ভূতনাথ?'

প্রিয়নাথ ভীষণ চুপচাপ ছিলেন। সকলের কথা যেন শুনছিলেন, অথচ শুনছিলেন না। ওঁর চশমার কাচে আলো পড়ে চকচক করছিল। চশমার গাঢ় রঙের মোটা ফ্রেমের সঙ্গে ভুরু জোড়া যেন মিশে গেছে। তার ওপরে কয়েকটা ছোট-বড় ভাঁজ স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খেতে পারেননি বলে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল। তিনি আপনমনে চুপচাপ বসে বাসুদেব ভদ্রর কথা ভাবছিলেন। সুপ্রকাশের শেষ কথাটার খেই ধরে ঠোঁটের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'মৃতেরা ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলে সেটাকে বলা হয় জীবন। বেঁচে থাকা মানে স্বপ্ন দেখা—ঘুম ভাঙলেই মৃত্যু। বাসুদেববাবুর স্বপ্নটা বেশ লম্বা ছিল। নাকি বলব ছুটিটা বেশ লম্বা ছিল....।'

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপ করে গেলেন। প্রিয়নাথ মৃত্যু নিয়ে

এত ভাবেন। মৃত্যুকে যেন ওঁরা নতুনভাবে অনুভব করতে পারছিলেন। সুপ্রকাশ পালিত কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজলেন। ঘরের পরিবেশ যেন অনুভব করতে চাইলেন।

ওঁরা সকলে তক্তপোশের ওপরে বসে ছিলেন। তার কাছাকাছি ছিল একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং-পালিশ কিছু বোঝার উপায় নেই। তার ওপরে ধূপদানিতে কয়েকটা ধূপ জ্বলছিল। সেই ধূপের গন্ধে ঘরের ভেতরে স্মৃতিচারণের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাসুদেব ভদ্র সম্পর্কে ওঁরা যাঁর-যাঁর মতন করে দু-চার কথা বলছিলেন। প্রিয়নাথ চুপ করে ওঁদের কথা শুনতে লাগলেন।

প্রিয়নাথের মনে হল, ধূপের গন্ধের সঙ্গে প্রথম বৃষ্টির গন্ধ মিশে গিয়ে ঘরের ভেতরে কেমন এক অলৌকিক আমেজ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম-ঘড়িটার দিকে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎই প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনারা বাসুদেববাবু সম্পর্কে নানা কথা বললেন। আমার সঙ্গে ওঁর তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে আমার ভূত-প্রেতের নেশার কথা তিনি জানতেন। তাই একদিন নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিলেন—শুনলে বিশ্বাস হবে না এমন কাহিনী.....।'

এমন সময় একজন মাঝবয়েসী লোক ঘরে ঢুকল। পরনে ধুতি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। হাতে শৌখিন ট্রে। তাতে সাজানো চা আর বিস্কুট।

সুপ্রকাশ লোকটিকে ডেকে বললেন, 'আয়, নিরঞ্জন। সকলের হাতে-হাতে দিয়ে দে।'

নিরঞ্জন প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিল। বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল সকলের হাতের নাগালে। তারপর ধীরে-ধীরে পা ফেলে চলে গেল।

পেন্ডুলাম-ঘড়িতে আটটার ঘন্টা বাজল।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে প্রিয়নাথ নিচু গলায় বললেন, 'বাসুদেববাবু ওকালতিতে হাতেখড়ি দেওয়ার আগে বছরখানেক নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। খাতা লেখার কাজ করেছেন, ওষুধের সেলস্‌ম্যান ছিলেন, হোটেলের ম্যানেজারি করেছেন, শাড়ির দোকানে চাকরি করেছেন। খানিকটা অস্থির মতির জন্যেই বোধহয় কোনও কাজেই টিকে থাকতে পারেননি। তারপর বাড়ির চাপে, আর ওঁর বাবার বকুনি খেয়ে ল' পড়তে ঢোকেন। ব্যস, ওঁর জীবনটা একটা পথ পেয়ে গেল।

'যে-ঘটনাটার কথা বাসুদেববাবু বলেছিলেন সেটা একটা ছোটখাটো হোটেলকে নিয়ে। তিনি তখন সেই হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন.....।'

*

বাসুদেবের বারবার হাই উঠছিল। এই ভয়ঙ্কর শীতে বারবার হাই তোলা মানে হিম-বাতাস বুকের ভেতরে টেনে নেওয়া। কিন্তু উপায় কী। কাউন্টার থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যে সরে পড়বেন তার উপায় নেই। ঠিক রাত এগারোটায় মালিকের ফোন আসবে। উনি দেখতে চান কাঁটায়-কাঁটায় রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর হোটেল খোলা আছে কি না। বাসুদেবকে যে চোদ্দশো টাকা মাস-মাইনে দেন, তার পাইপয়সা পর্যন্ত কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেন। কিন্তু কাস্টমার কোথায়! খোলা দরজা দিয়ে শুধু অন্ধকার রাত আর শীতের হালকা কুয়াশা চোখে পড়ছে। আর কখনও-কখনও দিল্লি রোড ধরে ছুটে যাওয়া ট্রাকের ঘোলাটে হেডলাইট।

যে-রাস্তাটা দিল্লি রোড থেকে ডানকুনির দিকে ঘুরে গেছে তারই বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেবের হোটেল। দোতলা হোটেলটা যে অত্যন্ত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার জরাজীর্ণ চেহারার দিকে তাকালেই স্পন্ডিলাইটিসের পেশেন্ট বলে মনে হয়। হোটেলের পলেস্তারা থেকে শুরু করে জল-কল-আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই নড়বড়ে অগোছালো।

হোটেলটার নাম 'দ্য হোস্ট'। সদর দরজায় তেরছা হয়ে থাকা রং-চটা একটা সাইনবোর্ডে ইংরেজি হরফে নামটা লেখা আছে। এ-হোটেলের ম্যানেজারিতে জয়েন করার পর থেকেই বাসুদেবের বারবার সাধ হয়েছে, হোটেলের নামের আগে একটা 'জি' হরফ বসিয়ে 'দ্য গোস্ট' করে দেন। বেকার জীবনের টানাপোড়েন ঘোচাতে কপাল ঠুকে এখানে কাজে লেগে গেছেন বটে, কিন্তু এখানে কাজ বলতে তেমন কিছু নেই। সারাদিন শুধু পালিশ-চটা কাউন্টারে বসে থাকো আর রাস্তার গাড়ি গোনো। আর মাঝে-মাঝে সাতকাজের ফরমাশের লোক এবং রাঁধুনি পঞ্চাননকে ডেকে একটু তম্বি করো।

বাসুদেব আরশোলাকে যথেষ্ট ভয় পান। কেন তিনি জানেন না। এ অনেকটা যেন মন্ত্রশক্তির মতো। যারা আরশোলা ভয় পায়, তারা জানে না কেন। আর, যারা ভয় পায় না, তারাও জানে না তার কারণ কী। এ-হোটেলে সুপ্রচুর আরশোলা আছে—নানা মাপের, নানা ধরনের। ফলে বাসুদেব আর পঞ্চানন বেশ ভয়ে-ভয়ে দিন কাটান। এবং রাতও।

হোটেলের মালিকের নাম হরেকৃষ্ণ মণ্ডল। জঘন্যরকম বড়লোক। তবে নানান কুসংস্কারে ভোগেন। আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

'দ্য হোস্ট'-এ হরেকৃষ্ণবাবু মাসে মাত্র একবার আসেন। হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে চলে যান। তাঁর অন্যান্য আরও জমকালো ব্যবসা আছে। সেগুলো নিয়েই

বেশি ব্যস্ত থাকেন। তবে তাঁর নিয়মের এতটুকু নড়চড় হওয়ার জো নেই।

যেমন, ঢুকে থেকেই বাসুদেব দেখছেন এ-হোটেলে একটা নিয়ম চালু আছে। হোটেল কখনও ফাঁকা রাখা চলবে না—কমসে কম খাতায়-কলমে। অর্থাৎ, সব ঘর ফাঁকা থাকলেও অন্তত দুটো ঘর ভরতি বলে সবসময় দেখাতে হবে। কারণ, হোটেলে কোনও বোর্ডার যদি এসে দ্যাখে সব ঘরই ফাঁকা, তা হলে সে হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে এ-হোটেলে আর উঠবে না। অন্য কোনও হোটেল খুঁজবে।

যুক্তিহীন কুসংস্কার। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

সেই কারণেই হরেকৃষ্ণবাবুর ঠিক করে দেওয়া দুটো কাল্পনিক নাম-ঠিকানা সবসময় হোটেল-রেজিস্টারে লেখা থাকে। অরিন্দম পোদ্দার, পাদরীপাড়া, চন্দননগর, হুগলি। আর কালাচাঁদ নস্কর, ব্রহ্মপুর, গড়িয়া। প্রথমজনকে আপাতত রাখা হয়েছে রুম নম্বর বারোয়—দোতলার দ্বিতীয় ঘরে। আর কালাচাঁদ নস্কর আছেন তেরো নম্বর ঘরে। অর্থাৎ, দোতলার তিন নম্বর ঘরে।

হোটেলে মোট সাতটা ঘর। একতলায় তিনটে, দোতলায় চারটে। তার মধ্যে একটা সিঙ্গল, বাকিগুলো ডাবল-বেড-এর ঘর। একতলার সিঙ্গলটায় বাসুদেবের থাকার কথা। তাই-ই থাকেন। তবে বেশিরভাগ সময়েই ঘর ফাঁকা থাকে বলে দোতলার চার নম্বর ঘরটায় তিনি রাত কাটান। ওই ঘরটায় দুটো জানলা বেশি আছে। হাওয়া-বাতাস ঠিকমতো খেলতে পারে। আর আরশোলার ভয় কম।

বাসুদেব শীতকাতুরে মানুষ। উলিকটের গেঞ্জি, ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি চড়িয়েও ওঁর শীত যাচ্ছিল না। তার ওপরে ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইছিল। বারবার রিসেপশনের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট পনেরো মতন বাকি। পঞ্চানন বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্য সিঁড়ির নীচের একটা খুপরি বরাদ্দ করা আছে। একটু আগেই ও বলে গেছে, বাসুদেবের রাতের খাবার ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে।

সুতরাং শীত এবং একঘেয়েমিতে ক্লান্ত বাসুদেব দেওয়াল-ঘড়ির মিনিটের কাঁটার সঙ্গে হাত ধরে হাঁটছিলেন। কতক্ষণে ওটা বারোটার দাগে পৌঁছবে?

ঠিক তখনই ওরা এল।

খোলা দরজার ফ্রেমে কালো অন্ধকারের পটভূমিতে ঠিক ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন বাসুদেব। দেখে খানিকটা চমকে উঠলেন। ওরা যেন আচমকা হাজির হয়েছে দরজায়। কারণ, বাসুদেব ওদের হেঁটে আসতে দেখেননি। কখন কোথা দিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা!

সামান্য কুয়াশা গায়ে মেখে পুরুষ ও মহিলাটি ভেতরে ঢুকল। খানিকটা যেন ছন্দে পা ফেলে চলে এল কাউন্টারের সামনে—বাসুদেবের খুব কাছে। বাসুদেব উগ্র পারফিউমের গন্ধ পেলেন।

ওদের দেখে বাসুদেবের কেমন যেন সন্দেহ হল। ওরা কি অবিবাহিত দম্পতি? এ-হোটেলে রাত কাটাতে এসেছে? কিন্তু ওদের পোশাক-আশাক ভারি অদ্ভুত।

পুরুষটির বয়েস তিরিশের এপিঠ-ওপিঠ। ইওরোপীয় ধাঁচের কাটা-কাটা মুখ। চওড়া কাঁধ। চোখ ছোট-ছোট, কিন্তু চাউনি যেন বর্শার ফলা। মাথার চুল তেল-চকচকে। টান-টান করে পিছনদিকে আঁচড়ানো। দাড়ি-গোঁফ কামানো তামাটে মুখে কেমন যেন ফ্যাকাসে ভাব। আর চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু হয়ে থাকায় মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে।

সঙ্গের মেয়েটির বয়েস পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ফরসা, রোগা, ছোটখাটো চেহারা। এলানো চুল। চোখের পালক অস্বাভাবিকরকম দীর্ঘ। গালে হালকা লালচে ভাব। কপালে বড় টিপ।

পুরুষটির গায়ে চেক-চেক ফুল-হাতা শার্ট, তার ওপরে একটা সাধারণ হাত-কাটা সোয়েটার। আর মেয়েটি সিল্কের শাড়ির ওপরে একটা মামুলি শাল জড়িয়ে রেখেছে।

এই ভয়ঙ্কর হাড় কাঁপানো শীতে এইরকম সাধারণ শীতের পোশাক পরে কী করে এরা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে? এই প্রশ্নটাই বাসুদেবের মনে প্রথম দেখা দিল।

ওদের মুখ এতই স্বাভাবিক যে, মনেই হচ্ছে না প্রচণ্ড ঠান্ডায় ওদের এতটুকুও কষ্ট হচ্ছে। যদি ওরা 'দা গোস্ট'-এ উঠে এক-দু-দিন ফুর্তি করতে চায় তো করুক। মনে-মনে ভাবলেন বাসুদেব। এরকম অনেক জোড়া পায়রাই এখানে রাত কাটাতে আসে। অত বাছবিচার করতে গেলে বিজনেস চলে না। হরেকৃষ্ণ মণ্ডল প্রথমেই বাসুদেবকে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু কোনওরকম গোলমাল হুজ্জুতি না হলেই হল।

পুরুষটির প্রথম প্রশ্নে বাসুদেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওঁর বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। গলা শুকিয়ে জিভটা গিরগিটির চামড়া হয়ে গেল পলকে।

'অরিন্দম পোদ্দার নামে কেউ এ-হোটেলে এসে উঠেছে?' ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল পুরুষটি।

বাসুদেবের মাথা গুলিয়ে গেল। হোটেলের খাতায় গত তিন মাস ধরেই তো এই ভুয়ো নামটা লেখা রয়েছে! এর আগেও বহু বছর ধরে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল হয়তো এই নামটা চালিয়েছেন। কিন্তু কোনওদিন কেউ এই কাল্পনিক বোর্ডারের খোঁজ করতে আসবে এ-কথা বাসুদেব কখনও আঁচ করতে পারেননি। এখন কী জবাব দেবেন এই প্রশ্নের?

'খাতা দেখে জলদি বলুন।' প্রায় ধমক দিয়ে উঠল পুরুষটি, 'অরিন্দম পোদ্দার নামে কেউ উঠেছে কি না দেখুন—।'

সব জেনেশুনেও খাতা খুললেন বাসুদেব। তিনি বলতেই পারতেন, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।' কিন্তু পুরুষটির চেহারা এবং গলায় এমন একটা কিছু ছিল যে, বাসুদেব কেমন যেন ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। ওঁর মনের কোণে একটুকরো সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল : এরা পুলিশের লোক নয় তো!

খাতা খুলে খুঁটিয়ে দেখার ভান করে বাসুদেব বললেন, 'হ্যাঁ—আছেন। দোতলার বারো নম্বর রুমে।'

পুরুষটি মেয়েটির দিকে তাকাল। অদ্ভুতভাবে হাসল। উত্তরে মেয়েটিও সামান্য হাসল। যেন কোনও গোপন ইশারা চালাচালি হল দুজনের ভেতরে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুললেন বাসুদেব। হরেকৃষ্ণ মণ্ডলের ফোন।

ওরা দু-জন তীব্র চোখে বাসুদেবকে দেখছিল। বাসুদেব কোনওরকমে 'হুঁ-হাঁ' বলে ফোনে কথা শেষ করলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটার ঘন্টা বাজতে শুরু করল।

ঘন্টা বাজার শব্দ শেষ হলে পুরুষটি নিচু গলায় বলল, 'আমরা পুলিশের লোক। কাউকে এ-কথা জানাবেন না। আমরা অরিন্দম পোদ্দারকে একটা ক্রাইমের ব্যাপারে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।'

বাসুদেব ফ্যালফ্যাল চোখে পুরুষটির দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওঁর মগজে কথাগুলো ঠিকমতো পৌঁছচ্ছিল না। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

'আজ রাতটা আপনার হোটেলে আমরা থাকব। আমাদের নাম-ধাম খাতায় লিখে নিন। সবাই জানবে আমরা অর্ডিনারি বোর্ডার।'

'সবাই' বলতে তো শুধু পঞ্চানন! আর খাতায় নাম-ধাম লিখলে তো মালিককে পয়সার হিসেব দিতে হবে! বাসুদেব মনে-মনে ভাবলেন।

পুরুষটি যেন বাসুদেবের মনের কথা বুঝতে পারল। পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'অরিন্দম পোদ্দারের পাশের ঘরটাই আমাদের দেবেন। তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

বাসুদেব টাকাটা নিয়ে ড্রয়ারে রাখলেন। ব্যালান্সটা ফেরত দেওয়ার জন্য ড্রয়ার হাতড়াচ্ছিলেন, পুরুষটি বলল, 'বাকিটা রেখে দিন। বয়-বেয়ারাদের বকশিশ দিয়ে দেবেন।'

বাসুদেব খাতার সঙ্গে সুতলি দিয়ে বাঁধা ডট পেনটা বাগিয়ে ধরে ওদের নাম জানতে চাইলেন।

পুরুষটি হেসে বলল, 'আমার নাম কালাচাঁদ নস্কর, আর ওর নাম লিখুন রীতা ...রীতা নস্করই লিখুন। তা হলে সবাই হাজব্যান্ড-ওয়াইফ ভাববে।'

বাসুদেব লিখবেন কী! ওঁর হাতে ধরা কলমটা তখন বরফের কলম হয়ে গেছে। চোখের সামনে গোটা দুনিয়াটা যেন টলে উঠল। পাছে মাথা ঘুরে পড়ে যান, তাই বাঁ হাতে কাউন্টারটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

নামটা তিনি ঠিক-ঠিক শুনেছেন তো! কালাচাঁদ নস্কর! খাতার দ্বিতীয় কাল্পনিক মানুষটা জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে দেখা দিয়েছে! আজ কি মঘা, নাকি ভূত চতুর্দশী? বাসুদেবের কেমন পাগল-পাগল লাগছিল।

'লিখুন—' তাড়া দিল পুরুষটি, 'কালাচাঁদ নস্কর, রীতা নস্কর। আর ঠিকানা যা-হোক কিছু একটা বানিয়ে-টানিয়ে লিখে দিন। তবে অরিন্দমের পাশের ঘরটাই চাই কিন্তু!'

অতি কষ্টে বাসুদেব লিখতে পারলেন। খাতায় লেখা কালাচাঁদ নস্করের নামের নীচে রীতা নস্কর লিখে দিলেন। তবে সই করার জন্য খাতাটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন না। কারণ, কালাচাঁদ নস্করের কাল্পনিক সইটা আগে থেকেই করা রয়েছে।

কিন্তু কালাচাঁদ এবং রীতা উলটো দিকে দাঁড়িয়েও ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। কারণ ওরা দুজনেই কেমন ঠোঁট টিপে হাসছিল।

'তেরো নম্বর ঘরটা আপনাদের দিলাম।' কোনওরকমে বলতে পারলেন বাসুদেব, 'আপনারা কি ডিনার করবেন? তা হলে কাছেই একটা ভালো ধাবা আছে—সারা রাত খোলা থাকে। ওখান থেকে খাবার আনিয়ে দেব। আমাদের এখানে খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই।'

রীতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—আমরা ডিনার সেরে এসেছি।'

পারফিউমের গন্ধে বাসুদেবের মাথা ঝিমঝিম করছিল। খাতা-পেন একপাশে গুছিয়ে রেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের কীবোর্ড থেকে তেরো নম্বর রুমের চাবিটা পেড়ে নিলেন। পঞ্চানন নিশ্চয়ই এতক্ষণে নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছে। ওকে বিরক্ত করে আর লাভ নেই। সুতরাং বাসুদেব কাউন্টারের পিছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হোটেলের সদর দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে বাইরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, আমিই আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। আমাদের বেয়ারাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ওদের নিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে রওনা হতে যাবেন, ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার বাসুদেবের নজরে পড়ল।

রিসেপশনের আলোটা তেমন জোরালো নয়। একটি মাত্র টিউব লাইট—তার আবার একটা দিক কালচে হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাসুদেবের দেখতে ভুল

হল না।

রীতা বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে কালাচাঁদকে কিছু একটা বলছিল। ফলে বাসুদেব ওর মুখের ডানপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। রীতার কানের ওপর থেকে চুল সরে গেছে একপাশে। তাই কানের গহ্বরটা সরাসরি নজরে পড়ছে। সেই গহ্বরের মুখে ছোট মাপের একটা মাকড়সার জাল। যেন কোনও গুহার মুখ আগলে মাকড়সার জালটা তৈরি হয়েছে।

এবং সেই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা খুদে মাকড়সা সামান্য নড়াচড়া করছে।

বাসুদেব কেন যে ভয় পেলেন তা বুঝতে পারলেন না। কল্পনায় কানের গহ্বরটাকে তিনি ধূলিমলিন কোনও প্রাচীন সুড়ঙ্গ বলে ভাবছিলেন। মাকড়সার জাল ছিঁড়ে তার ভেতরে মনে-মনে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। অজানা ভয়ঙ্কর কিছু আবিষ্কারের ভয়ে বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন।

রীতা মাথা ঝাঁকাল। ওর চুল ঝটকা মেরে সরে এল কানের ওপরে। মাকড়সার জালটা ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু বিচিত্র এক আতঙ্ক বাসুদেবের হৃৎপিণ্ডটাকে আঠালো কাগজের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রইল।

হোটেলের ফাঁকফোকর দিয়ে কুয়াশা আর শীত পা টিপে-টিপে ঢুকে পড়ছিল। বাসুদেব হঠাৎই শিউরে উঠলেন।

সেটা লক্ষ করে কালাচাঁদ বলল, 'কী হল, মশাই! এই শীতেই কাবু হয়ে পড়ছেন! আমাদের ওখানে গেলে বুঝতেন ঠাণ্ডা কাকে বলে!'

রীতার সঙ্গে চোখাচোখি হল কালাচাঁদের। ওরা দুজনে একইসঙ্গে হেসে উঠল। হাসির দমকে ওদের ছিপছিপে শরীর দুটো সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল।

'আমাদের ওখানে' মানে! বাসুদেব কালাচাঁদের কথাটার মানে বুঝতে চাইলেন। কিন্তু কী ভেবে ওদের আর কিছু জিগ্যেস করলেন না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রীতা জানতে চাইল, 'অরিন্দম পোদ্দার কবে এখানে এসে উঠেছে?'

'পরশুদিন.......সন্ধেবেলা........।' বাসুদেব মরিয়া হয়ে গল্প তৈরি করছিলেন। যা মনে আসে তাই বলছিলেন।

'ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'না।'

এবার কালাচাঁদ নস্কর বলল, 'অরিন্দম পোদ্দারকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে যে, ও ভয় পেয়েছে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বাসুদেব। এভাবে বাতাসে কতক্ষণ দুর্গ তৈরি করা যায়! আন্দাজে গল্প বলার তো একটা সীমা আছে! কিন্তু কিছু একটা তো বলতেই

হয়! অতএব বললেন, 'ঘর ছেড়ে উনি খুব একটা বেরোন না। তবু দু-একবার যা দেখেছি তাতে ভয় পেয়েছেন বলে মনে হয়নি.....।'

তেরো নম্বর ঘরের দরজায় ওরা তিনজন পৌঁছে গিয়েছিল। বাসুদেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নাইট ল্যাচ খুলে ওদের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু ফিরে আসার পথে আর-একবার হোঁচট খেলেন বাসুদেব।

বারো নম্বর ঘরের দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না!

বাসুদেবের পা আর কাজ করছিল না। আজ রাতে এসব কী শুরু হয়েছে! যারা নেই—কোনওদিন ছিল না—তারা সব একে-একে হাজির হচ্ছে! নাকি তিনিই ভুল করে কোনও এক সময়ে বারো নম্বর ঘরের আলো জ্বেলে গেছেন!

খানিক ইতস্তত করে ভয়ে-ভয়ে ঘরের কলিংবেল টিপলেন বাসুদেব।

টুং-টাং শব্দ শেষ হতেই ভেতর থেকে ভারি গলায় কেউ সাড়া দিল।

'কে?'

বাসুদেবের পাকস্থলীতে কেউ যেন বরফের ছুঁচ ফোটাতে শুরু করল। ওঁর হাত কাঁপতে লাগল থরথর করে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। অনেক চেষ্টায় গলা দিয়ে স্বর বের করতে পারলেন তিনি।

'আমি, স্যার—হোটেলের ম্যানেজার।'

'কী চাই?' রুক্ষ প্রশ্ন ভেসে এল বন্ধ দরজার ও-পিঠ থেকে।

'আমার রেজিস্টারে মনে হয় একটু গোলমাল হয়ে গেছে, স্যার। আপনাকে কি আমি বারো নম্বর ঘরই দিয়েছিলাম?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আপনার নামটা কাইন্ডলি বলবেন, স্যার। রেজিস্টারের সঙ্গে একটু চেক করে নেব—।'

'অরিন্দম পোদ্দার.......।'

নামটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ দরজা খুলে গেল।

এবং অপার্থিব এক হিমেল বাতাসের ঝাপটা বাসুদেবকে অসাড় করে দিতে চাইল।

অরিন্দম পোদ্দারকে ভালো করে দেখতে চাইলেন বাসুদেব। কিন্তু দেখতে পেলেন কি?

মাথায় ঘোমটা মুড়ি দিয়ে চাদর জড়ানো। তাতে মুখের অনেকটাই আড়াল হয়ে গেছে। তার ওপরে চোখে কালো চশমা। ঘরের আলোটা মাথার ঠিক পিছনে থাকায় মুখটা অস্পষ্ট অন্ধকার দেখাচ্ছে।

'আর কিছু জানতে চান?' সামান্য ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রশ্ন করল অরিন্দম।

'না, স্যার।' মাথা নাড়লেন বাসুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগেই একটা জিনিস বাসুদেবের নজরে পড়েছিল। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে রয়েছে। নুন, চিনি, নাকি মিল্ক পাউডার? বন্ধ কোনও কৌটো জোর করে খুলতে গিয়ে ওরকম ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে?

এলোমেলো বহু কথা ভাবতে-ভাবতে নীচে নেমে এলেন বাসুদেব। ওঁর শরীর তখনও কাঁপছিল। কতটা শীতে, কতটা ভয়ে তা বলা মুশকিল।

কাউন্টারের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ফোন করে ব্যাপারটা কি মালিককে জানানো যায়? উনি কি আদৌ বিশ্বাস করবেন? আর যদিও বা বিশ্বাস করেন, তা হলে কাল সকালের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কালাচাঁদ আর রীতা যদি সত্যি-সত্যি পুলিশের লোক হয় তা হলে পুলিশে খবর দিলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রীতার কানের মাকড়সার জালটা কি অস্বাভাবিক নয়? অরিন্দমের চাদরের সাদা-সাদা গুঁড়োগুলোই বা কী?

এইসব উলটোপালটা ভাবনা বাসুদেবের বুকের ভেতরে উথালপাথাল ঢেউ তুলছিল। একবার ভাবলেন পঞ্চাননের পাশটিতে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু তারপরই আবার মনে হল, না, ওপরের ঘরে শোওয়াই ভালো। যদি রাতে কোনও কাণ্ড হয় তা হলে বাসুদেব জানতে পারবেন। আসলে ভয়ের পাশাপাশি কৌতূহলও বাসুদেবের মনে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। অরিন্দম পোদ্দার যদি সত্যি-সত্যিই একজন মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে কালাচাঁদ আর রীতা কি ওকে এখানেই অ্যারেস্ট করবে? কী করেছে অরিন্দম—খুন, চুরি, ডাকাতি? ও যদি মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে ওকে অ্যারেস্ট করতে গেলে তো রিভলবার ইত্যাদি দরকার! অথচ কালাচাঁদ আর রীতা এ-হোটেলে এসে উঠেছে কোনও লাগেজ ছাড়াই। প্যান্টের পকেটে অথবা কোমরে কোনওরকম অস্ত্র লুকনো আছে বলে তো মনে হয়নি!

আরও আধঘণ্টা পর নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন বাসুদেব। নিজের ঘর বলতে চোদ্দ নম্বর ঘর—কালাচাঁদ আর রীতার পাশের ঘরটা।

পা টিপে-টিপে ওপরে উঠে এলেন আবার। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছিল। সুতরাং ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছাড়লেন। উলিকট গেঞ্জির ওপরে হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে তার ওপরে শাল জড়ালেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন।

অন্যদিন হলে এরপর ঘুম। এবং বিছানায় শোওয়ামাত্রই ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির দাপট শুরু।

কিন্তু আজ? আজ দু-চোখের পাতা এক হয় কই!

ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করলেন বাসুদেব। তারপর....রাত তখন কত ঠিক বলা মুশকিল.....শুনতে পেলেন তীব্র শিসের শব্দ। আওয়াজটা এত মিহি যে, কানের পরদা যেন ফুটো করে দিতে চায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বাসুদেব। ঘরের লাগোয়া অ্যাটাচ্‌ড বাথে ঢুকে পড়লেন। ফলে দ্বিতীয় শিসের শব্দটা বেশ জোরে শোনা গেল। কারণ, তেরো আর চোদ্দ নম্বর ঘরের বাথরুম দুটো গায়ে-গায়ে লাগানো। এমনকী বেয়ে উঠে সামান্য চেষ্টা-চরিত্র করলে এ-বাথরুম থেকে ও-বাথরুমে ঢুকে পড়া যায়।

পরের বাথরুমে উঁকি মারার স্বভাব বাসুদেবের কোনওকালেই ছিল না। কিন্তু এখন, এই অদ্ভুত রাতে, একটা অচেনা আকর্ষণ ওঁকে নীতি থেকে সরিয়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যেই জলের পাইপে পা দিয়ে বাথরুমের দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়লেন। ভেন্টিলেটারের কাচের পাল্লা খুব সাবধানে ঠেলে সরিয়ে পাশের বাথরুমে উঁকি মারলেন।

যে-দৃশ্য বাসুদেব দেখতে পেলেন, সন্দেহ নেই, সেটা ভারি অদ্ভুত।

পাশের বাথরুমে কেউ নেই। বাথরুমের পাল্লা খোলা। সেই খোলা অংশ দিয়ে ঘরের বেশ খানিকটা নজরে পড়ছে। ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে আছে। আর গোটা ঘরে নীল আলোর এক অলৌকিক আভা খেলে বেড়াচ্ছে। সেই আলোর আভা ঘরের কোনও-কোনও জায়গায় কমে গেলে তবেই গুঁড়োগুলোকে সাদা রঙের বলে চেনা যাচ্ছে।

বাসুদেব বোধহয় কৌতূহলে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কারণ, গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিয়ে শরীরটাকে সরীসৃপের মতো ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দেওয়াল আর জলের পাইপ আঁকড়ে নেমে পড়লেন তেরো নম্বর ঘরের বাথরুমে।

একটা তুচ্ছ জিনিস বাসুদেবকে অবাক করল।

বাথরুমের মেঝে খটখটে শুকনো। সেখানে জলের কোনও ছিটেফোঁটাও নেই। অর্থাৎ, এসে থেকে কালাচাঁদ বা রীতা বাথরুম ব্যবহার করেনি।

বাথরুমের পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারলেন বাসুদেব।

ঘরের ঠিক মাঝখানে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রীতা ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে শিস দিচ্ছে। আর কালাচাঁদ মূকাভিনেতার ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছে রীতার কাছে। ওদের দুজনের শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল নীল আলো।

রীতার খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ামাত্রই কালাচাঁদের ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো হল। কিসিং গোরামি মাছের মতো ওরা ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে চুমু খেল। ওদের ঠোঁটজোড়া

যেন লোহা আর চুম্বকের মতো গায়ে-গায়ে সেঁটে গেল। এবং একইসঙ্গে শিসের শব্দ থেমে গেল।

তারপর ওরা পায়ে-পায়ে পিছোতে শুরু করল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওদের ঠোঁটজোড়া একই অবস্থায় পরস্পরের গায়ে এঁটে রইল। শুধু কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওদের ঠোঁটের অংশ ইলাস্টিকের মতো লম্বা হয়ে ওদের শরীর দুটোর মাঝের দূরত্ব বাড়তে লাগল।

হঠাৎই একটা 'চকাৎ' শব্দ হয়ে ঠোঁট দুটো ছেড়ে গেল। কালাচাঁদ আর রীতা বেহালার ছড় টানা তারের মতো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। আর পাউডারের মতো মিহি সাদা গুঁড়ো ঘরময় উড়তে লাগল।

শীতে কেঁপে উঠলেন বাসুদেব। এবং তখনই সাদা গুঁড়োগুলোকে কুচো বরফ বলে চিনতে পারলেন। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে তা হলে বরফকুচি ছড়িয়ে ছিল! এ ঘরের মেঝেতেও তাই। তা হলে কি.....তা হলে কি......?

রীতা এবার মুখ খুলল।

'অরিন্দমকে এবার ডেকে নিয়ে আসি। ও কী বলতে চায় ওর মুখ থেকেই শোনা যাক।'

খিলখিল করে বিদ্রূপের হাসি হাসল কালাচাঁদ : 'কী আর বলবে! আমি ওর বাজে কথা শুনতে চাই না। আমি গয়নার ভাগ চাই। ও-দোকান থেকে আমরা যা হাতিয়েছি তা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার গয়না হবে.....।'

'আর আমাকে যে তুমি ওর কাছে থেকে হাতিয়েছ!' চোখ মটকে বলল রীতা। অচেনা এক শীতের হাওয়া বুকের ওপর থেকে ওর শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দিল।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা দিয়ে কাছে পেয়েছি—কারও কাছ থেকে চুরি করে নয়।'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো শরীর বিদ্যুৎঝলকের মতো ছুটে এল সামনে। সংঘর্ষ হল, কিন্তু কোনও শব্দ হল না। তারপর বাসুদেবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দুটো শরীর নাইলনের দড়ির মতো পাক খেয়ে গায়ে-গায়ে জড়িয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে চলল ওদের ভালোবাসাবাসি। তারপর ওরা পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল।

'চলো, এবার অরিন্দমকে নিয়ে আসি।' বলল কালাচাঁদ।

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের চারটে হাত লম্বা হয়ে ধেয়ে গেল বারো নম্বর আর তেরো নম্বর ঘরের পার্টিশন ওয়ালের দিকে।

একতাল ময়দার মধ্যে যেভাবে লোকে হাত ঢুকিয়ে দেয় ঠিক সেভাবেই চারটে হাত গেঁথে গেল দেওয়ালে। এবং পরমুহূর্তেই একটা অবয়বহীন শরীর টেনে নিয়ে এল ঘরের ভেতরে।

বাসুদেব দেখলেন, দেওয়ালটা যেন রবারের তৈরি। একটা চাদরের মতো টান-টান হয়ে অরিন্দমকে মুড়ে রয়েছে। সেই রবারের চাদরের আড়ালে অরিন্দমের দেহটা প্রাণপণ ছটফট করে চলেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু রীতা আর কালাচাঁদ নাছোড়বান্দা। অরিন্দমের চেষ্টা দেখে ওরা মজা পেয়ে হেসে উঠল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে অরিন্দমকে দেওয়ালের চাদর ছিঁড়ে বের করে নিয়ে এল বাইরে।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস পাক খেতে লাগল ঘরের ভেতরে। বাসুদেবের চোয়াল থরথর করে কাঁপছিল। দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে বিশ্রীরকম শব্দ হচ্ছিল।

অরিন্দমের পরনে সেই একই পোশাক। গায়ে চাদর মুড়ি দেওয়া, চোখে কালো চশমা। আর পায়ে হালকা নীল রঙের পাজামা।

ওকে খাটের ওপরে বসিয়ে রীতা আর কালাচাঁদ ওর দু-পাশে দাঁড়াল।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করল, 'গয়নাগুলো কোথায়?'

'আমার কাছে নেই।' রুক্ষ বিরক্ত স্বরে জবাব দিল অরিন্দম। তারপর হঠাৎই চোখ থেকে কালো চশমাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল।

বাসুদেব অবাক হয়ে দেখলেন, অরিন্দম পোদ্দারের বাঁ চোখের মণি ঘোলাটে সাদা। বড়সড় টল গুলির মতো মণিটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কালাচাঁদ রীতার দিকে তাকিয়ে কী যেন ইশারা করল। তারপর ওরা দুজনে অরিন্দমের কাছ থেকে চার-পাঁচ পা করে পিছিয়ে গেল। তারপর দুজনেই ডান হাতের পাতা মেলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে অরিন্দমকে তাক করল।

দশটা আঙুলের ডগা থেকে সবুজ শিখার বিদ্যুৎ-ঝিলিক ধেয়ে গেল অরিন্দমের দিকে। আর তৎক্ষণাৎ ওরা তিনজনেই পোশাকহীন হয়ে গেল। কিন্তু ওদের নিরাবরণ চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন বাসুদেব। তিনটে নগ্ন শরীর আপাদমস্তক স্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি। যেন কাটগ্লাসের তৈরি তিনটে ভাস্কর্য। তা থেকে নীল আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে। স্বচ্ছ শরীরের কোনও-কোনও জায়গা দিয়ে শরীরের ওপাশের জিনিসপত্র স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সবুজ শিখার ছোঁয়ায় অরিন্দম পোদ্দারের শরীরে ফাটল ধরল। মাথা থেকে রক্তের ধারা শুরু হল। তারপর শরীর বেয়ে নামতে লাগল।

অরিন্দম টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল।

বরফের ওপরে লাল সিরাপ ঢেলে দিলে সেই সিরাপ বরফের নানা ফাটল বেয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে নেমে এলে যেমন দেখায়, অরিন্দমকে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিল। অনেকটা যেন বরফের ওপরে উজ্জ্বল লাল বাটিক প্রিন্টের কাজ।

যন্ত্রণায় ঝুঁকে পড়ে দাঁতে-দাঁত চেপে অরিন্দম বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সব দিয়ে দিচ্ছি....।'

রীতা খিলখিল করে হেসে উঠল : 'তোমাকে দিতে হবে না। আমরাই নিয়ে নিতে পারব।'

'রীতা, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। ভুল জায়গায় আমার ভালোবাসা রেখেছিলাম। আমি কখনও ভাবিনি তোমার মতো....।'

অরিন্দম আর কথা বলতে পারল না। তার আগেই কালাচাঁদের আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে আসা সবুজ বিদ্যুৎ ওকে শতচ্ছিন্ন করে দিল। পলকে বরফের ধুলো হয়ে গেল অরিন্দম। ওর শরীর কোন এক অলৌকিক বাতাসে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। শীতের ঢেউ উথালপাথাল করতে লাগল ঘরের ভেতরে।

রীতা আর কালাচাঁদ হাত বাড়াল পার্টিশন ওয়ালের দিকে। ওদের হাত লম্বা হয়ে দেওয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল অরিন্দমের ঘরে। একটু পরেই একটা ব্রিফকেস টেনে নিয়ে এল।

ব্রিফকেসটা আগের মতোই রবারের চাদর দিয়ে মোড়া। রীতা আর কালাচাঁদ হ্যাঁচকা টান মারতেই রবারের চাদর ছিঁড়ে ব্রিফকেসটা চলে এল ঘরের ভেতরে। ওটা বিছানায় রেখে একটানে ওটার ঢাকনা খুলে ফেলল কালাচাঁদ।

সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘর। সোনা-রং ঠিকরে পড়ল রীতা আর কালাচাঁদের বরফের শরীর থেকে।

ব্রিফকেস ভরতি সোনার গয়না।

বরফের শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে রীতা আর কালাচাঁদ হাসতে শুরু করল পাগলের মতো। তারপর হাসির দমক থামলে ওরা ব্রিফকেসের গয়নাগুলো আঁজলা ভরে বারবার তুলে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তখনই ব্রিফকেস থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ অসাবধানে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু সেদিকে ওরা কোনও ভ্রূক্ষেপই করল না। ওরা পাগলের মতো গয়না ঘাঁটতে লাগল।

একসময় ওদের পাগলামি শেষ হল।

তখন ব্রিফকেসটা বন্ধ করে কালাচাঁদ সেটা রীতার হাতে দিল, বলল, 'চলো, আমাদের কাজ শেষ।'

তারপর ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল, শরীরে শরীর। ওদের ঘিরে বরফের গুঁড়ো তখনও পাক খাচ্ছে।

আবার তীব্র শিসের শব্দ শোনা গেল। আর একইসঙ্গে ভেসে বেড়ানো বরফের গুঁড়ো গাঢ় হল। বাসুদেব ভালো করে কিছু আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তীব্র শীতে ওঁর শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। তুষার ঝড়ে গোটা ঘরটা উত্তাল হয়ে গেল। রীতা কিংবা কালাচাঁদকে আর দেখা যাচ্ছিল না। শিসের শব্দটা তীব্র হতে-হতে হঠাৎই একসময় মিলিয়ে গেল।

আর তখনই বাসুদেব জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বাথরুমের মেঝেতে।

*

বাসুদেবের জ্ঞান ফিরেছিল ভোরের দিকে।

গতরাতের ঘটনা ওঁর কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, বারো নম্বর আর তেরো নম্বর ঘর আগের মতোই পরিপাটি করে সাজানো। সম্প্রতি কেউ সেখানে থেকেছে বলে মনে হয় না। কালাচাঁদ, রীতা অথবা অরিন্দমের কোনও চিহ্নই সেখানে নেই।

ব্যাপারটা পুরোপুরি দুঃস্বপ্ন বলে বাসুদেব মেনে নিতেন, যদি না তেরো নম্বর ঘরের খাটের নীচে হঠাৎ করেই খবরের কাগজটা তিনি দেখতে পেতেন।

খবরের কাগজের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার একটা খবর ওঁর নজর কাড়ল :

পুলিশের গুলিতে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু

১৬ জানুয়ারি, হুগলি : গতকাল সকাল দশটা নাগাদ বালি স্টেশনের কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে কালাচাঁদ নস্কর ও রীতা নস্কর নামে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু হয়। ওদের কাছে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার সোনার গয়না পাওয়া যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে রীতা জানায় যে, ওরা ওদের এক শাগরেদ অরিন্দম পোদ্দারকে গত ১৪ জানুয়ারি রাতে খুন করে। ভাগাভাগির বিবাদ থেকেই এই খুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই তিনজনের ডাকাতদলই গত ১০ জানুয়ারি বউবাজারের একটি অভিজাত সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি করেছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বালি স্টেশনের কাছে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কালাচাঁদ নস্করের কাছে একটি রিভলবার ও তিন রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়।

ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবেই শেষ হত, যদি না বাসুদেব হঠাৎই খবরের কাগজটার তারিখ খেয়াল করতেন।

কাগজের তারিখটা দশ বছরের পুরনো।



নগ্ন নির্জন রাত

'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি, ...'

এ-গল্প আমি শুনেছি রিমকির কাছে। ডাক নাম রিমকি, আর পোশাকী নাম রূপশ্রী। আমার বড়দার মেয়ে সোনালীর সঙ্গে রিমকি কলেজে পড়ত। এরকম সবুজ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি—সবসময় টগবগ করে ফুটছে। যদি কখনও জিগ্যেস করতাম, 'এত এনার্জি তুই পাস কোথা থেকে?' তাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত মেয়েটা। বলত, 'মহাকাশ থেকে, কাকু, মহাকাশ থেকে!'

সূর্যের ভেতরে যেমনটা হয়, ওর ভেতরেও বোধহয় ক্রমাগত নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া হয়ে টন-টন হাইড্রোজেন বদলে যাচ্ছে হিলিয়ামে, আর তৈরি হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

একটা সময়ে আমি বড়দার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতাম। তখন রিমকি প্রায়ই আসত সোনালীর কাছে। আর আমার ভূতচর্চার কথা শুনে এক-একদিন এসে ভূতের গল্প শোনার আবদার ধরত।

ভূত-প্রেতের গল্প ও শুনতে চাইত কেন সেটা আমি প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। গল্প শেষ হলেই ও বলে উঠত, 'কী দারুণ বোগাস ট্রু-স্টোরি। কাকু, সত্যি করে বলুন না, মিথ্যেকে সত্যিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করে আপনার কী লাভ!' এবং তারপরই খিলখিল করে হাসি।

এইসব হাসি আর গল্পের মাঝেই চলত সরষের তেল দিয়ে মুড়ি-বাদাম-পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা মেখে খাওয়া, আর বউদির তৈরি করে দেওয়া চা।

রিমকির সেই বয়েসের মুখটা বেশ মনে পড়ে। ফরসা লম্বাটে মুখ। টানা-টানা চোখ। বাঁ কানের নীচে একটা বড় তিল। কপালে কালো টিপ। পরনে উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে চুড়িদার।

আমার বয়েসটা যদি বছর পনেরো-ষোলো কম হত তা হলে অবশ্যই আমি রিমকির প্রেমিক হতে চাইতাম। ও পাত্তা না দিলেও ওর আশেপাশে ঘুরঘুর

করতাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সত্যিই এরকমটা ভাবতাম। বেশ বুঝতাম, রিমকির মধ্যে এমন একটা টান আছে যে, যে-কোনও পুরুষই ওকে ভালোবাসতে চাইবে।

ভূত যে নেই, এ-কথা প্রমাণ করতে রিমকি প্রায়ই মহাতর্ক জুড়ে দিত আমার সঙ্গে। অনেক সময় বউদি আর সোনালীও ওর দলে যোগ দিত।

আমি ওকে শুধু বলতাম, 'রূপশ্রী, যেদিন তোমার হাড়ে-হাড়ে অভিজ্ঞতা হবে, সেদিন বুঝবে আমার গল্পগুলো বোগাস ট্রু-স্টোরি, না শুধু ট্রু-স্টোরি।'

সত্যি, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কত ধ্যানধারণা বদলে যায়! যাকে চিরকাল 'নেই' বলে ভেবে এসেছি তাকে 'আছে' বলে মেনে নিই। যেসব ঘটনা একসময় 'হয় না, হতে পারে না' বলে বিশ্বাস করতাম, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিশ্বাস কেমন বদলে যায়—তখন মনে হয়, 'হয়, হতেও পারে'।

কিন্তু আমি কখনওই চাইনি, মর্মান্তিক কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রিমকির বিশ্বাস বদলে যাক।

অথচ তাই হয়েছিল।

প্রায় বারো বছর পর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতেই বদলে যাওয়া রিমকিকে আমি চিনতে পারলাম। ওর টগবগে সবুজের ওপরে যেন সন্ধ্যার শান্ত ছায়া নেমে এসেছে।

একপাশে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটু সহজ হয়েছিল রিমকি। নরম গলায় বলেছিল, 'কাকু, শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন।'

তারপর ওর গল্পটা আমাকে বলেছিল রিমকি—পুরনো রিমকির ভাষায় 'বোগাস ট্রু-স্টোরি'। আর নতুন রিমকির ভাষায়? কী জানি!

শুরুর কবিতার লাইন দুটোও ওরই মুখে শোনা—গল্প বলার সময় গুনগুন করে আবৃত্তি করেছিল ও। শুনে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের সব কথা যেন ওই মারাত্মক দুটো লাইনের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে।

রিমকি আমাকে বলেছিল.......।

আমি বাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই একেবারে হইহই শুরু হয়ে গেল।

সুকান্তি একেবারে চেঁচিয়েই উঠল, 'মা, মা, মঙ্গলগ্রহ থেকে রূপশ্রী এসেছে! শিগগির নেমে এসো!'

দোতলা থেকে নামতে-নামতে পিসিমা বলে উঠলেন, 'রূপশ্রী আবার কে?'

'রূপশ্রী মানে রিমকি। ভুলেও তো আমাদের বাড়িতে আসে না, তাই বললাম



মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। ও এখন কথায়-কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে—বিগ বস। আমাদের আর পাত্তা দেবে কেন! দেখলে না, অত করে আসতে বললে, ছোড়দির বিয়েতেও এল না!'

আমি সুকান্তিকে ধমকে উঠলাম, 'তুই থামবি! নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজে নে—নইলে বকবক করে হাঁফিয়ে পড়বি।'

পিসিমা ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন।

পরনে সাদা থান, গলায় সরু চেন, হাতে দু-গাছা চুড়ি, চোখে চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়েস কত হবে এখন? মনে-মনে হিসেব করলাম। ষাট পেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। অথচ টকটকে ফরসা রং এতটুকু মলিন হয়নি। এখনও দারুণ সুন্দরী। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। শুনেছি, পিসেমশাই পিসিমার রূপ দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সে-কথা বুড়ো বয়েসেও বারবার বলতেন। আরও বলতেন, পিসিমা আগে চলে গেলে সে-কষ্ট তিনি সইতে পারবেন না। ভগবান বোধহয় পিসেমশাইয়ের মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সময় হওয়ার অনেক আগেই ওঁকে ডেকে নিয়েছেন।

'রিমকিকে রূপশ্রী বললে কখনও চিনতে পারি!' পিসিমা হেসে বললেন। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, ইতির বিয়েতে এলি না কেন?'

আমি কাঁধের ব্যাগটা বাঁ হাতে সামলে ঝুঁকে পড়ে টিপ করে পিসিমাকে একটা প্রণাম করলাম।

পিসিমা আমার চিবুক ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে সে-আঙুল ছোঁয়ালেন : 'ইতি বারবার তোর কথা বলছিল.......।'

'কী করব, পিসিমা। একটা কনফারেন্সে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল।'

সুকান্তির দুই দিদি : বড়দি শ্রুতি, আর ছোড়দি ইতি। শ্রুতিদি নাকি অনেকদিন আগেই পিসিমাকে জানিয়ে দিয়েছে ও বিয়ে করবে না। কেন তা খুলে বলেনি। পিসিমাই আমাকে এ-কথা বলেছিলেন। তখন পিসিমার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল পিসিমা সবই জানেন, কিন্তু আমাকে বলতে চাইছেন না। পরে অবশ্য কানাঘুষোয় আমি অনেকটাই জেনেছি।

ইতি আমার চেয়ে বছরতিনেকের বড়। আর সুকান্তি আমার পিঠোপিঠি। তাই সুকান্তির সঙ্গেই আমার আড্ডা বেশি জমে। পিসিমা সবসময় সবাইকে বলেন, 'রিমকি আর সুকান্তি এক জায়গায় হলেই সেখানে হইহই করে হাট বসে যায়। কী করে যে ওরা এত বকবক করতে পারে সে ওরাই জানে।'

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্তি আর পিসিমা দোতলায় উঠল।

উঠেই দেখি, বাঁদিকের বড় বেডরুমটায় শ্রুতিদি বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা এলোমেলো বাতাস খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে পাগল করে দিচ্ছিল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

শ্রুতিদির চুল উড়ছিল। শ্রুতিদি কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাকে দেখে কাগজ থেকে মুখ তুলে সামান্য হাসল শ্রুতিদি : 'কীরে, রিমকি, কেমন আছিস?'

ওকে দেখে মনে হল ভোরবেলাতেই স্নান সেরে নিয়েছে।

শ্রুতিদি পিসিমার মুখ পেয়েছে। ফরসা, রোগা। দেখলে একটু অসুস্থ বলে মনে হয়। আগে এরকম ছিল না। বোধহয় কানাঘুষোয় শোনা সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার পর এরকম হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই কীরকম যেন ঠান্ডা—উৎসাহ উদ্দীপনার ছিটেফোঁটা নেই কোথাও।

আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছ?'

আবার সামান্য হাসি। তারপর ইতির বিয়েতে না আসা নিয়ে আর-এক প্রস্থ অনুযোগ।

ঘরে ঢুকে সবে একটা চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়েছি, পিসিমা বললেন, 'এবার তোকে ছাড়ছি না—দু-চারদিন থেকে যেতেই হবে। সুকান্তি রথীনকে আর শোভাকে ফোন করে খবর দিয়ে দেবে।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার উত্তর শুনলে তোমরা ফ্ল্যাবারগাস্টেড হয়ে যাবে।'

'ফ্ল্যাবারগাস্টেড মানে কী রে?' সুকান্তি জিগ্যেস করল।

'এও জানিস না! হতবাক, হতভম্ব।'

পিসিমা বললেন, 'তা হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো উত্তরটা শুনি।'

'আমি তোমাদের এখানে দু-চারদিন থাকতেই এসেছি। দেখছ না, ব্যাগটা কী ভারি!'

উত্তর শুনে সুকান্তি আর পিসিমা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। হওয়ারই কথা। কারণ, আমার ছোটবেলা-বড়বেলার অনেকটা সময় শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়িতেই কেটেছে। আজ বুঝতে পারি, আমি যে 'আমি' হয়ে উঠেছি, তার জন্যে পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক ঋণ রয়ে গেছে আমার।

তাই ওদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

শ্রুতিদি একটু অবাক হয়ে তিনটে পাগলকে দেখছিল।

হঠাৎই একটা গ্যালপিং ট্রেন ছুটে গেল সামনের রেল-লাইন দিয়ে। পিসিমাদের পুরনো বাড়ির জানলা-দরজা মিহি শব্দ তুলে কাঁপতে লাগল।

ট্রেনের এই কু-ঝিকঝিক শব্দ আমার বালিকা বয়েসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তখন পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটি মানেই শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়ি। আর ট্রেনের কু-ঝিকঝিক।

পিসিমাদের বাড়িটা রাইল্যান্ড রোডের ধারে। বোধহয় একশো কি দেড়শো বছরের পুরনো। পিসেমশাই এটা কেনার পর জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে-টারিয়ে

নিয়েছেন। একতলায় একটা ঘর আর কলতলা-বাথরুম। দোতলায় দুটো ঘর আর পশ্চিমে রেল-লাইনের দিকে একটা টানা বারান্দা। আর একেবারে কোণের দিকে একটা আধুনিক ছাঁদের বাথরুম পিসেমশাই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে এলাম।

পিসিমা চা করে দিলেন। তারপর ইতিদির বিয়ের গল্প শুরু হল। কোন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার মেনু কীরকম হয়েছিল, বাসী বিয়ের দিন কী-কী মজা হয়েছিল, শয্যা তোলার সময় ভালোমানুষ বরের কাছ থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা আদায় করা হয়েছিল, এইসব।

এর কিছু-কিছু আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি। কারণ, ওরা বিয়েতে এসেছিল। তবুও আর-একবার শুনতে খারাপ লাগছিল না।

আমাদের কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টায় শ্রুতিদি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। ছোট বোনের বিয়ে নিয়ে নানান কথা বলছিল। তারপর একসময় আমাকে বিয়ের ফটো দেখাতে বসল।

এসেছিলাম সেই সকাল আটটায়। কখন যে বেলা বারোটা বেজে গেছে কারও খেয়ালই নেই।

পিসিমা একবার সুকান্তিকে বলেছিলেন, 'তুই আজ অফিসে বেরোবি না?'

সুকান্তি হেসে উঠে বলল, 'পাগল হয়েছ, মা! অ্যাদ্দিন পর রিমকি এসেছে আর আমি অফিস যাব! প্রণয়কে বলে দেব, ও খবর দিয়ে দেবে। আমার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে দু-চারদিন ডুব মারাটা কোনও ব্যাপার না।'

পিসিমা আমাকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিতেই সুকান্তি বলল, 'না, মা। খাওয়ার দেরি আছে। তোমরা বসে গল্প করো—আমি মাংস কিনে নিয়ে আসি। বটতলায় গেলে পেয়ে যাব। আমি তো জানি, রিমকি ছোটবেলা থেকেই মাংসাশী প্রাণী।'

সুকান্তি চলে যেতেই পিসিমা আমার অফিসের কথা শুনতে চাইলেন। বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরন-ধারণ পিসিমার একেবারেই অচেনা। তাই বাচ্চা ছেলেকে বোঝানোর মতো করে আমি সব বোঝাতে লাগলাম। বললাম, বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলোর মধ্যে কী কম্পিটিশান। কেন আমাকে কলকাতা ছেড়ে বারবার বাইরে দৌড়তে হয়।

শ্রুতিদি আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। শোনার পর বলল, 'তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি। তোর মতো লাইফ আমার খুব পছন্দ।'

পিসিমা একবার অদ্ভুত চোখে বড় মেয়ের দিকে তাকালেন।

আমি শ্রুতিদিকে বললাম, 'শ্রুতিদি, সবই নদীর এ পার কহে.......। সত্যিকারের সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায় সেটা কারওর নেই। ওটা শুধু খুঁজে বেড়ানোর জিনিস—কখনও পাওয়া যায় না।'

শ্রুতিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার হঠাৎই বেশ খারাপ লাগছিল।

খটাখট শব্দে একটা লোকাল ট্রেন চলে গেল।

খোলা জানলা দিয়ে লাইনের ধারের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। কাছেই ইলেকট্রিকের তারে দুটো শালিক বসে রয়েছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিল। জোরালো রোদে কয়েকটা পাতা আয়নার মতো চকচক করছিল।

পিসিমা বললেন, 'শ্রুতিকে কত বলি, টিউশানি কর—ও করতে চায় না।'

'টিউশানি আমার ভাল্লাগে না।' শ্রুতিদি বলল।

আমি ওকে বললাম, 'তোমার তো আঁকার হাত ভালো ছিল। হাতের কাজ-টাজ কিছু করতে পারো.....বাটিকের কাজ...।'

শ্রুতিদি মলিন হাসল। ছোট্ট করে 'হুঁঃ.....' শব্দ করল।

এরপর গল্প আর তেমন জমল না। আমি স্নান করার তোড়জোড় শুরু করলাম। পিসিমাও রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখতে চলে গেলেন।

রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে যখন খেতে বসেছি, তখন পিসিমা সুকান্তিকে বললেন, 'কীরে, কী ঠিক করলি? তুই কি তা হলে একতলার ঘরে শুবি? আর রিমকি তোর ঘরে শোবে?'

সুকান্তি খেতে-খেতে মায়ের দিকে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, 'আমাকে সব লটবহর নিয়ে তা হলে নীচে নামতে হবে। তা ছাড়া আমার ব্যাচিলার্স ডেন কি রিমকির ভালো লাগবে?' একটু হাসল সুকান্তি।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'একতলায় শুতে আমার কোনও প্রবলেম নেই, পিসিমা।'

'না, তা না.....যদি ভয়-টয় পাস....।'

আমি হাসলাম : 'চোর-ডাকাত হলে ভয় পেতেও পারি। তা ছাড়া আবার ভয় কীসের! আমার একা-একা শোওয়ার অভ্যাস আছে।'

সুকান্তি খাওয়া থামিয়ে বলল, 'রিমকির আই. কিউ. দিন-দিন কমে যাচ্ছে। মা চোর-ডাকাতের ভয়ের কথা বলছে না—বলছে গোস্ট প্রবলেমের কথা।'

'ভূতের ভয়!' আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না : 'পিসিমা, সত্যি..... ভূত বলে কিছু থাকলে তবে না তাকে ভয় পাব! ভূত হচ্ছে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যে বড়দের তৈরি একটা মিথ—মিথ্যেও বলতে পারো। আমি তো আর বাচ্চা নই!'

শ্রুতিদি কেমন অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছিল। ওর বলা সকালের কথাটা মনে পড়ল : তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি।

সুকান্তি পিসিমাকে বলল, 'রিমকি একটুও বদলায়নি। সেই ছোটবেলার মতোই—ঝাঁসি কি রানি। কী বল, রিমকি!'

আমি বললাম, 'তুই ছোটবেলা থেকে যা কুঁড়ে! তুই কখনও নিজের আস্তানা ছাড়বি! বিছানায় পাশ ফিরতে হলেও তো মাকে ডাকিস পাশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।'

সুকান্তির সঙ্গে লাঠালাঠি করতে-করতেই খাওয়া শেষ হল।

এরপর শুতে যাওয়ার পালা। সুকান্তি বলল, 'দাঁড়া, তোর জন্যে ক'টা ম্যাগাজিন নিয়ে আসি—।'

আমি বললাম, দরকার নেই—আমার সঙ্গে বই আছে, কিন্তু ও শুনল না। ওর ঘরে গেল ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে আসতে।

দোতলার বড় ঘরটায় পিসিমা আর শ্রুতিদি শোয়। তার পাশের ছোট ঘরটায় সুকান্তি। ওর ঠিক নীচেই আমার জন্যে বরাদ্দ করা ঘরটা। এমনিতে ওটা বন্ধই পড়ে থাকে—ইতিও ওখানে শুত না। পিসেমশাই বেঁচে থাকতে ঘরটা ব্যবহার হত। এককালে ছিল বৈঠকখানা—পরে পিসেমশাইয়ের শোওয়ার ঘর। ঘর ছাড়া বাকিটা পুরনো ধাঁচের বারান্দা, কলতলা আর বাথরুম।

খাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমাদের সঙ্গে বসে আর-এক প্রস্থ গল্প, আর কিছুটা সময় টিভি দেখলাম। তারপর হাই উঠতে লাগল।

পিসিমা বললেন, 'আজকের মতো ঢের হয়েছে। এবারে শুতে যা—।'

সুকান্তি ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে আমাকে খোঁচা দিল : 'চল, তোকে সি অফ করে আসি।'

একতলার ঘরের দরজায় এসে ও বলল, 'ঢুকেই বাঁদিকে সুইচবোর্ড—তুই তো জানিস। আর বাথরুম....।'

আমি ম্যাগাজিনগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, 'মায়ের কাছে মাসির গল্প করিস না। গুডনাইট। কাল সকাল-সকাল উঠবি—আমাকে এসকর্ট করে মর্নিং ওয়াকে নিয়ে যাবি, সানরাইজ দেখাবি।'

ও ভুরু উঁচিয়ে বলল, 'এটা কি পুরী নাকি! এখানে সানরাইজ রান্নাঘরের তাকে পলিপ্যাকে পাওয়া যায়।' হাসল সুকান্তি। তারপর গলাটা সিরিয়াস করে বলল, 'সত্যি তুই ভয় পাবি না তো!'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'পেলে তোকে ডাকব।'

'তা হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবি...জানিস তো আমার স্লিপ খুব ডিপ।'

ও চলে গেল।

আমি ঘরের আলো জেলে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। সাবধানের মার নেই ভেবে খিল আর ছিটকিনি—দুটোই এঁটে দিলাম। তারপর ম্যাগাজিনগুলো বিছানায় রেখে ঘরের এক কোণে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে নিলাম।

ঘরে আলো বলতে একটিমাত্র টিউব লাইট। আর আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট কাঠের আলমারি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা বুককেস, আর একটা ছোট খাট। আলমারির মাথায় পুরনো আমলের টুকিটাকি জিনিস—তার মধ্যে একটা পেতলের দোয়াত আর একটা পেতলের ফুলদানি। তবে এত ময়লা হয়ে গেছে যে, পেতলের বলে আর বোঝা যায় না।

ঘরে তিনটে জানলা : একটা ভেতরের কলতলার দিকে, আর দুটো রেল-লাইনের দিকে। তিনটে জানলাতেই শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো।

বিছানায় গা ঢেলে দিতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলাম—যেন কেউ আমার জন্যে পালকের কোল পেতে দিয়েছে। অথচ বিছানাটা নিতান্তই মামুলি।

সামান্য আড়মোড়া ভেঙে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিলাম। ব্যাগে আরভিং ওয়ালেসের 'সিন্‌স অভ ফিলিপ ফ্লেমিং' রয়েছে, কিন্তু সেটা আর বের করতে ইচ্ছে করল না।

রাতে বই পড়া আমার বহুদিনের অভ্যেস। তাই ক্লান্ত লাগলেও ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাতে লাগলাম। বহুদিন সিনেমার খবর নেওয়া হয় না। তাই ম্যাগাজিনটা পড়তে খারাপ লাগছিল না।

মাঝে-মাঝে ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই, একটা ট্রেন চলে যাওয়ার পর, কে যেন আলতো করে আমার নাম ধরে ডাকল।

'রূপশ্রী......।'

আমি চমকে উঠলাম। চোখ ফেরালাম দরজার দিকে। দরজায় ছিটকিনি, খিল সব ঠিকঠাকই আছে।

সুকান্তি কি দরজার বাইরে থেকে আমাকে ডাকল। কিন্তু ডাকটার ধরন যেন কেমন অদ্ভুত। কেউ যেন ভীষণ আহ্লাদ করে আমার নামটা উচ্চারণ করেছে।

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা বাজতে মিনিট পাঁচ-সাতেক বাকি। এ-সময়ে সুকান্তি কেন আমাকে ডাকতে আসবে! নাকি ও ঝাঁসির রানির সাহস পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

ম্যাগাজিনটা মাথার কাছে রেখে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। একটু সতর্কভাবে দরজার কাছে গেলাম। দরজার পাল্লার জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কে? সুকান্তি?'

উত্তরে কোনও সাড়া পেলাম না। তবে মনে হল যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার প্রশ্ন করলাম আমি, 'কে? কে?'

কোনও উত্তর নেই।

পিসিমাদের সদরে গ্রিলের দরজা বসানো। তার ঠিক পরেই একটা ভারি কাঠের দরজা। দরজাগুলো তালা-খিল-টিল দিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ থাকে। এ ছাড়া বাইরে থেকে উটকো লোক ঢুকে পড়ার কোনও পথ নেই। তিনতলার ছাদের দরজাতেও

বরাবর রাতে খিল এঁটে দেওয়া হয়।

সুতরাং, কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভীষণ বোকা-বোকা লাগল। মনে হয় আমার নাম ধরে কেউ ডাকেনি। ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ থাকায় আমি হয়তো ভুল শুনেছি। সামান্য এই কারণে যদি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি তা হলে সুকান্তি টিটকিরি দিয়ে আর টিকতে দেবে না।

চুপচাপ বিছানায় ফিরে এলাম। ছোট টেবিলটায় জলের জগ আর গ্লাস রাখা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পলকে তেষ্টা পেয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে চলে গেলাম টেবিলের কাছে। গ্লাসে জল ঢেলে প্রাণভরে তেষ্টা মেটাতে গিয়েও থেমে গেলাম। বেশি জল খাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, রাতে আর বাথরুমে বেরোতে চাই না।

গলাটা সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। আন্দাজে ভর করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঝোপঝাড় থেকে রাত-পোকার ডাক কানে আসছিল।

চোখটা একটু সয়ে আসতেই রেল-লাইনের দিকের খোলা জানলা দুটোর দিকে নজর পড়ল। ঘরের তুলনায় অন্ধকার সেখানে খানিকটা যেন কম। কালো আকাশ, দু-একটা তারা, আর গাছ-গাছালির কয়েকটা ডালপালা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

আর-একটা ট্রেন ঝমাঝম করে ছুটে গেল। তারপরই যেন চারিদিক চুপচাপ হয়ে গেল। বাতাসে নড়ে ওঠা পাতার খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

হঠাৎই ডাকটা শোনা গেল আবার।

'রূ - প - শ্রী.....।'

আবেগ থরথর গলায় ভীষণ চাপা ফিসফিসে স্বরে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল কেউ।

না, এবারে শুনতে আমার কোনওরকম ভুল হয়নি। তিনটে অক্ষরকে আলাদাভাবে টেনে-টেনে উচ্চারণ করেছে সে। ভালোবাসার জ্বরে বেপথু কোনও রোমান্টিক কণ্ঠস্বর।

পিসেমশাইয়ের গলা এটা নয়। তা ছাড়া তিনি অপঘাতে মারা যাননি যে, ভূত-প্রেত হয়ে উপোসী ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন।

তা হলে এমন করে কে ডাকছে আমায়!

আমি বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন সামান্য নড়াচড়া করলেই অতল খাদে পড়ে চিরকালের মতো তলিয়ে যাব।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর ভাবতে শুরু করলাম, ঘরের আলোটা জ্বেলে দেব কি না। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে আমার—স্বীকার করতে লজ্জা নেই—বেশ ভয়-ভয় করছিল। অথচ আমার মনের একটা অংশ ভেতর থেকে বারবার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভূত বলে কিছু নেই। যারা ভূতের

ভয় পায় ভূতেরা তাদের দেখা দেয়। কিন্তু আমার মনের বাকি অংশ কিছুতেই সেসব যুক্তি মানতে চাইছিল না।

ঠিক তখনই 'খুট' করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ ঘরের দরজা খুলল। অন্ধকারে বাইরে থেকে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটাও টের পেলাম আমি। অথচ একটু আগেই দেখেছি দরজায় খিল-ছিটকিনি ভালো করেই আঁটা রয়েছে!

আমি শুয়ে-শুয়েই ঘামতে শুরু করলাম। অথচ মাথার ওপরে সিলিং পাখা একই তালে ঘুরে চলেছে। এরপর কি আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!

দরজার শব্দ হল আবার। তারপর অতি সাবধানে খিল লাগানোর শব্দ, ছিটকিনি আঁটার শব্দ।

তার মানে! কেউ কি ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করছে! অসম্ভব!

নিজেকে বারবার বললাম, এ-সময় মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। অযথা ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। কিচ্ছু নেই।

যুক্তি দিয়ে সবই বুঝতে পারছিলাম, অথচ ভীষণ ভয় করছিল।

আমার খুব কাছে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর পা ফেলে হেঁটে বেড়ানোর অস্পষ্ট শব্দ পেলাম।

আমার চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। তবে নাক আর কান দ্বিগুণ সজাগ ছিল। হয়তো সেইজন্যেই পারফিউমের হালকা গন্ধটা টের পেলাম।

এই পারফিউম আমি ব্যবহার করি না। কিন্তু কেন জানি না মনে হল, এটা পুরুষদের পারফিউম। আর গন্ধটা আমাকে যেন টানছিল, নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই একটা জমাট ছায়া জানলার চৌকো ফ্রেমে দেখতে পেলাম— তবে মাত্র একপলকের জন্যে। তারপরই ওটা আলমারির দিকে সরে গেল।

এবার আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু ভোকাল কর্ড স্ট্রাইক করে বসল।

আশ্চর্য! যখন আমি চিৎকার করতে পারতাম তখন লজ্জায় সঙ্কোচে চিৎকার করতে চাইনি। আর এখন প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইছি অথচ পারছি না।

হঠাৎই মনে হল আমার বিছানার খুব কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে—ঝুঁকে পড়েছে আমার শরীরের ওপরে। পারফিউম ছাড়া আমি যেন একটা উগ্র পুরুষালি গন্ধ পাচ্ছি। একই সঙ্গে পায়রার বুকের পালকের মতো নরম আলতো একটা ছোঁয়া আমাকে অবশ করে দিল। হাতে, পায়ে, গলায়, বুকে। টিভি চালিয়ে তার স্ক্রিনের খুব কাছে হাত নিয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়, এ-ছোঁয়া ঠিক সেইরকম।

আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র হুইস্‌ল দিয়ে ঝমাঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাল কেটে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। পলকে

পারফিউমের গন্ধ, অলৌকিক ছোঁয়া—সব উধাও। আমার ঘুমের ঘোরও কেটে গেল। গলা পর্যন্ত যে-ভয় উথলে উঠেছিল সেটা থার্মোমিটারের পারার মতো দ্রুত নামতে লাগল।

প্রচণ্ড এক চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় আলোর সুইচ জ্বেলে দিলাম।

ঘরে কেউ নেই।

ঘরটা শেষ যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।

হঠাৎই আমার চোখ গেল ঘরের দরজার দিকে।

দরজার খিল-ছিটকিনি দুটোই খোলা। দরজার পাল্লা দুটো ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক হয়ে আছে।

তা হলে কি ঘরে চোর ঢুকেছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তো খিল-ছিটকিনি খোলা অসম্ভব!

দরজা আবার ভালো করে বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিলাম। পাল্লা দুটো বারকয়েক টেনেটুনে দেখলাম ঠিক আছে কি না। তারপর বিছানায় ফিরে এলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সওয়া তিনটে।

শরীর আর বইছিল না। আলো জ্বেলে রেখেই শুয়ে পড়লাম। কারণ, আলো নিভিয়ে দিলে আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।

দুমদুম করে দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানলার দিকে তাকিয়েও বোঝা যাচ্ছে বেলা অনেক হয়ে গেছে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। সেই সঙ্গে সুকান্তি আমার নাম ধরে ডাকল: 'রিমকি! রিমকি! ওঠ, ওঠ—ন'টা বাজে! তুই বলে মর্নিং ওয়াকে যাবি, সানরাইজ দেখবি!'

আমি সাড়া দিলাম : 'খুলছি, খুলছি! এক মিনিট....।'

এক মিনিটের কম সময়েই পোশাক পালটে টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

'কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিসনি নাকি!'

আমি জড়ানো গলায় বললাম, 'না।'

তখনই ও দরজার কাছ থেকে জ্বলন্ত টিউব লাইটটা দেখতে পেল।

'কী রে, সারা রাত আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছিলি নাকি!'

'হ্যাঁ। আলো-পাখা অফ করে দে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলছি। পিসিমাকে বল চা করতে—।'

ওপরে গিয়ে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়েই আমি বললাম, 'পিসিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমাদের ওই একতলার ঘরটা কিন্তু হন্টেড।'

'হন্টেড মানে! ঠিক কী বলতে চাইছিস?' সুকান্তি জিগ্যেস করল।

আমি চায়ের কাপে আর-একটা লম্বা চুমুক দিয়ে নির্বিকারভাবে বললাম, 'হন্টেড মানে হন্টেড। ওই ঘরটায় ভূতের উপদ্রব আছে। আমাকে আগে বলিসনি কেন!'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

পিসিমা, শ্রুতিদি, সুকান্তি—সবাই বেশ ফ্যালফেলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিসিমা আর শ্রুতিদি তো মনে হল আমার কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেছে। আর সুকান্তি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। বুঝতে চাইছিল আমি সত্যি-সত্যি ভূতের কথা বলছি, নাকি ঠাট্টা করছি।

কিছুক্ষণ পর সুকান্তি মুখ নিচু করে মিনমিন করে বলল, 'না......মানে..... ভাবিনি যে, এখনও ও-ঘরটায় কোনও প্রবলেম হতে পারে।' মুখ তুলে পিসিমার দিকে তাকাল ও : 'মা, তুমি তো জানো, ছোড়দির বন্ধু ঈশিতা তো এসে রাতে ও-ঘরে ছিল। তখন তো কিছু হয়নি! তারপর......।'

লক্ষ করলাম, শ্রুতিদির চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। আর পিসিমাও কেমন যেন অস্বস্তি পেয়ে এর মুখে ওর মুখে চাইছেন।

সুকান্তি আমার কাছে ঝুঁকে এসে জানতে চাইল ; 'তুই ঠিক কী দেখেছিস বল তো! কী হয়েছে কাল রাতে?'

'কী আবার হবে! একটা লোক ঢুকে পড়েছিল আমার ঘরের ভেতরে। অথচ রাত্তিরে শোওয়ার আগে খিল-ছিটকিনি ঠিকমতোই এঁটে দিয়েছিলাম।'

আমি চা খেতে-খেতে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম।

জানলা দিয়ে রোদ-ঝলমলে দিন দেখা যাচ্ছে। চারপাশে কোথাও অশরীরী-অলৌকিকের ছায়ামাত্র নেই। এই পরিবেশে কাল রাতের ব্যাপার-স্যাপারগুলো বলতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, এমন তো নয় যে, বাইরে থেকে কায়দা করে একতলার ঘরটার খিল-ছিটকিনি খোলা যায়! তা হলে কোনও বদমাস লোক চুরি বা অন্য কোনও বদ মতলবে বাইরে থেকে খিল-ছিটকিনি খুলে মাঝরাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে! তারপর ট্রেনের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে পালিয়েছে।

সে-কথাই সুকান্তিকে বললাম।

সুকান্তি মানতে চাইল না। বলল, 'না রে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ঘরটা বোধহয় সত্যি-সত্যিই হন্টেড। তোর আগে আরও দুটো এরকম কেস হয়েছে।'

'কীরকম, শুনি—।'

এবার পিসিমা মুখ খুললেন : 'জয়তীকে তুই চিনবি না। আমার ননদের বড় মেয়ে। বছরপাঁচেক আগে ও ওয়াল্‌শ হসপিটালে ওর এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিল। কী একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যেন। তখন ও আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছিল। রাতে নীচের ওই ঘরটায় শুয়েছিল। ও কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিল—।'

'কী দেখেছিল রাতে?' আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল।

পিসিমা শাড়ির আঁচলে হাত মুছলেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়া, ভাতটা একবার দেখে আসি। আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আসি।'

পিসিমা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বলতে শুরু করলেন।

'রাত কত হয়েছিল জয়তীর খেয়াল নেই। তবে খুব গভীর রাত নিশ্চয়ই। হঠাৎই ও দেখল রেল-লাইনের দিকে একটা জানলার গ্রিলের বাইরে একটা ছায়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ওকে লক্ষ করছে।

'জয়তী প্রথমটায় ভেবেছে চোর-ছ্যাঁচড় হবে। ও চিৎকার করতে যাবে, ঠিক তখনই দ্যাখে ছায়াটা গ্রিল ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল—ঠিক একতাল মাখনের মতো। জয়তী আর চিৎকার করতে পারেনি। ও কাঠ হয়ে শুয়ে ছায়াটাকে লক্ষ করতে চেষ্টা করছিল।

'তখন শুক্লপক্ষ ছিল। তাই আবছা হলেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল জয়তী। লোকটা ওর বিছানার ধার ঘেঁষে পায়চারি করছিল। জয়তী ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়েছিল। একটা সেন্টের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর......তারপর.......।'

সুকান্তি আচমকা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মা, আমি একটু বাজারে বেরুচ্ছি। আচ্ছা, কাঁচালঙ্কা কি ফুরিয়ে গেছে, না আছে?'

'একশো নিয়ে আসিস।'

সুকান্তি একটা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে বেরিয়ে গেল।

আমি পিসিমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'সুকান্তির সামনে পরের কথাগুলো বলতে অসুবিধে হত....।' পিসিমা বললেন, 'ও অবশ্য জানে—তাই আমার অসুবিধেটা বুঝতে পেরে চলে গেল। তোরা মেয়ে, তোদের সামনে বলা যায়.....।

'এরপর লোকটা জয়তীর গায়ে হাত দিয়েছিল। ওর.....ওর....এত......এত ভালো লেগেছিল যে, ও মুখ ফুটে বারণ করতে পারেনি।' পিসিমা চোখ নামালেন। ওঁর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল।

শ্রুতিদিরও দেখলাম কান-টান লাল হয়ে গেছে। অনধিকারী ভালোবাসায় তৃপ্তি পাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু শরীর যে সবসময় মনের কথা মানতে চায় না।

'এইসব করতে-করতেই লোকটা বিড়বিড় করে কবিতার মতো কী একটা

আবৃত্তি করেছিল। জয়তী দু-চারটে লাইন মনে করে আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না। শুরুটা এইরকম ছিল : "যে আমাকে চিরদিন......", তারপর কী যেন—।'

শ্রুতিদি হঠাৎ বলে উঠল, '"যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে / অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি, / সেই নারীর মতো"....তারপর খানিকটা ঝাপসা, মনে পড়ছে না .....তারপর আবার "আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, / আর তুমি নারী—/ এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।"'

আমি অবাক হয়ে শ্রুতিদিকে দেখছিলাম। ও থামতেই বলে উঠলাম, 'নামটা তোমার শ্রুতির বদলে শ্রুতিধর হলে মানানসই হত।'

শ্রুতিদি হাসল।

পিসিমা আবার বলতে শুরু করলেন।

'তারপর ছায়াটা আলমারির কাছে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কীসব করতে থাকে। তারপর চলে আসে টেবিলের কাছে। সেখানে ঝুঁকে পড়ে খানিক সময় কাটিয়ে দেয়। জয়তী ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় টেবিলের ড্রয়ারটা খোলার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এরপর ছায়াটা চলে যায় আলমারির পেছনে। একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর আবার ফিরে আসে জয়তীর কাছে। আবার ওইসব শুরু করে দেয়। জয়তী যখন নেশার ঘোরে প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের লাইন দিয়ে কানফাটানো শব্দ করে একটা ট্রেন ছুটে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে জয়তীর সেন্স ফিরে আসে। ও চেঁচিয়ে ওঠে। তখন অন্ধকার ছায়াটা যেন হাওয়ায় ভেসে জানলার গ্রিল ভেদ করে পলকে পালিয়ে যায়।'

পিসিমার গল্প শেষ হতেই আমি হেসে বললাম, 'ভূত নয়, পিসিমা—চোর। খুব বদ টাইপের চোর। তোমাদের থানায় ইনফর্ম করা উচিত ছিল। লোকটা আলমারি খোলার চেষ্টা করে পারেনি। টেবিলের ড্রয়ারটাও খুলতে পারেনি। তখন তোমার ঘুমন্ত রিলেটিভকে নিয়ে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছে। ইস, আমি যদি কাল সময়মতো চেঁচিয়ে উঠতে পারতাম! তা হলে সুকান্তি লোকটাকে পাকড়াও করে কষে ধোলাই দিতে পারত—।'

পিসিমা মাথা নাড়লেন : 'না রে, চোর-টোর নয়। পাঁচ-সাত বছর ধরে লোকটা একই বাড়িতে একই ঘরে একই কাজ করে চলেছে—এ কখনও হয়! কই, পাড়ার আর কারও বাড়িতে তো কখনও এরকম শুনিনি! তা ছাড়া জানলার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে লোকটা ঘরে ঢুকল কেমন করে, আবার পালালই বা কেমন করে! আর কাল রাতে বাইরে থেকে তোর ঘরের দরজার খিল-ছিটকিনি খুলল কেমন করে, বল!'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জেদী গলায় বললাম, 'তুমি যে এত জোর দিয়ে বলছ, তুমি নিজে কখনও ভূতটাকে চোখে দেখেছ?'

পিসিমা পলকে কেমন উদাস হয়ে গেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুত গলায় বললেন, 'না, আমি দেখিনি। প্রথমবার এরকম ঘটনা শোনার পর আমি একা ও-ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু কেউ আসেনি। আমাদের অনেক রিলেটিভ ও-ঘরে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনও প্রবলেম হয়নি। অবশ্য তারা বেশিরভাগই পুরুষ ছিল—আর দু-একজন বয়স্কা মহিলা। তাদের বেলা ওই নিশিকুটুম্ব দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়বার সে দেখা দিল জয়তীর বেলায়। তখন জয়তী তোর মতোই—দেখতে-শুনতে সুন্দর, অল্প বয়েস। আমার মনে হয়, অল্পবয়েসী সুন্দরী মেয়েদের দিকে এই ভূতটার আলাদা কোনও টান আছে। ওদের প্রাণপণে ভালোবাসতে চায়। নইলে কেউ ওরকম করে! ওরকম কবিতা বলে!'

আমি ঠোঁট টিপে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম, 'তুমি যতই বলো, পিসিমা, আমি ঠিক যেন ফুল্‌লি কনভিন্সড হতে পারছি না।'

এবার শ্রুতিদি জবাব দিল, 'তুই তখন থেকে এরকম জেদ ধরে আছিস কেন, রিমঝি। শুরুতে তুই-ই তো বললি ঘরটা হন্টেড। তা ছাড়া মা এই যে বলল, ছায়াটা আলমারির পেছনে ঢুকে গেল—একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে এল—এটা কি কোনও মানুষের পক্ষে ইম্‌পসিব্‌ল নয়?'

'কেন, ইম্‌পসিব্‌ল কেন!'

'আলমারির পেছনেই তো দেওয়াল! সেখানে দু-ইঞ্চিও ফাঁক নেই! তা হলে একটা গোটা মানুষ ঢুকবে কেমন করে!'

আমি দমে গেলাম।

শ্রুতিদি বলেই চলল, 'তোকে তো লোকটা টাচ করেছিল। ওটা কোনও মানুষের ছোঁয়া? তুই বল! তখন তোর মন-শরীর অবশ হয়ে যায়নি?' একটু চুপ করে থেকে শ্রুতিদি আবার নিচু গলায় বলল, 'ভাগ্যিস ট্রেনটা এসে গিয়েছিল....নইলে আরও বাজে কিছু হতে পারত!'

তার মানে! আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কাল রাতে ঝমাঝম শব্দে ট্রেন ছুটে গেছে বলে আমি বাজে কিছু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি! পিসিমাদের ওই রিলেটিভ—জয়তী—সে-ও একইরকমভাবে বেঁচে গেছে!

শ্রুতিদি এত সব জানল কেমন করে! কী করে মনে রাখতে পারল কবিতার ওই রোমান্টিক লাইনগুলো!

শ্রুতিদির মুখ থমথম করছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি এত সব জানলে কেমন করে?'

শ্রুতিদির চোখে জল এসে গেল পলকে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলতে গেলে ছুট-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে পিসিমার দিকে তাকালাম।

পিসিমা মাথা নিচু করে বসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'শ্রুতিকে দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়। তার আগে কখনও কিছু হয়নি। সে-রাতে ও একা শুয়েছিল ওই ঘরে। সেদিনটা আবার বাংলা বন্‌ধ ছিল। তাই কোনও ট্রেন চলেনি। অশরীরী সেই প্রেতটা সেদিন আর মাঝপথে থামেনি। ওর....ওর....সাধ মিটিয়ে তারপর উধাও হয়ে গেছে....।'

আমি পাথর হয়ে গেলাম। আমি এসব কী শুনছি!

পিসিমা কেঁদে ফেললেন : 'সেদিন থেকে শ্রুতি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। পরে....পরে....ওকে মানসিকভাবে সুস্থ করার জন্যে নকল অ্যাবরশন করাতে হয়। তোকে আমি লজ্জায় এ-কথা আগে বলিনি। তা ছাড়া কেউই তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না! সবই আমাদের কপাল......।

'জয়তীর ব্যাপারটার পর এতবছর পার হয়ে গেছে....তাই ভেবেছিলাম ঘরটার দোষ কেটে গেছে। এখন দেখছি যায়নি! আমাদের হয়তো বাড়িটাই ছেড়ে দিতে হবে...।'

শ্রুতিদির বিয়ে না করার কারণ হিসেবে কানাঘুষোয় কিছু-কিছু শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, আর-পাঁচটা ঘটনার মতোই ওর লাভার ওকে বিপদে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু এখন পিসিমার মুখে এসব কথা শোনার পর সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

আমি কল্পনায় এক অতৃপ্ত প্রেমিককে দেখতে পাচ্ছিলাম—যার বয়েস একশো, দুশো, তিনশো, কি চারশো বছর। যার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আজও মেটেনি। এককালে সে হয়তো এইখানেই থাকত। পাগলের মতো আকুল ভালোবাসা নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করত।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। পায়রার বুকের নরম পালক আমার শরীরে বিলি কাটতে লাগল। আমি একটা চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

ঠিক তখনই পশ্চিমের রেল-লাইন ধরে ঝমঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল। তার হুইস্‌লের শব্দটা আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।



কনে-দেখা আলোয়

'—সব মেয়েকেই ভালো দেখায়।' ছোট হয়ে আসা বিড়িতে জোরালো টান দিয়ে মন্তব্য করলেন জগৎ শ্রীমানী।

'কনে-দেখা আলো কাকে বলে জানতে পারি কি?' বরেন মল্লিক পান চিবোচ্ছিলেন—একটু খোঁচা দিয়েই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন জগৎ শ্রীমানীর দিকে।

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল পাড়ার রবিশঙ্করবাবুর মেয়ের বিয়ে নিয়ে। গতকাল বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেছে। পাত্রের চেহারা একেবারে কার্ত্তিকের মতো। অথচ মেয়ের চেহারা মোটেই মানানসই নয়। কালোকোলো এই মেয়েটির পাত্রস্থ হওয়া নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল অবশ্যই, তবে পাড়ার লোকেদের দুশ্চিন্তা ছিল যেন তার শতগুণ। তাই হঠাৎ করে সেই মেয়েটির বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে অনেকেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ পালিত, জগৎ শ্রীমানী, বরেন মল্লিক, বিজন সরকার, আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার—সকলেরই সেই বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল। তবে প্রিয়নাথের এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল গতকালই। ওঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল—পাড়ার নেমন্তন্নে যেতে পারেননি।

বৈঠকখানায় বসে বেশ কিছুক্ষণ এই বিয়ে নিয়ে আলোচনার পর সুপ্রকাশ হঠাৎই বলেছিলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন, রবিশঙ্করবাবু হয়তো কনে-দেখা আলোয় মেয়েকে দেখিয়েছেন। তাই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে গেছে....।'

তাঁরই উত্তরে জগৎ শ্রীমানী মন্তব্য করেছেন এবং বরেন মল্লিক পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন।

বিড়ির শেষ টুকরোটা তক্তপোশে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন জগৎ শ্রীমানী। তারপর ভুরু উঁচিয়ে গোল-গোল চোখে বরেন মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন, 'বরেন, তুমি কি সত্যিই জানতে চাইছ, না আমি জানি কি না সেটা টেস্ট করছ?'

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে চোখ সরিয়ে নিলেন। বোঝা গেল, জগৎ শ্রীমানীর শেষের কথাটাই ঠিক।

প্রিয়নাথ গলাখাঁকারি দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন, বললেন, 'কনে-দেখা আলো কাকে বলে সবাই জানে। সূর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক পরে—



মানে, গোধূলির সময়—যে-আলোটা থাকে সেটাই কনে-দেখা আলো...।' হাসলেন ভূতনাথ : 'কিন্তু এটা কেউ বলতে পারেন, সেই আলোতে কেন কনেকে, বা কাউকে ভালো দেখায়?'

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে একে-একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন ভূতনাথ।

সবাই চুপচাপ। মাথার ওপরে ব্রিটিশ আমলের কাঠের ব্লেডওয়ালা পাখা ঘুরছে, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎই অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজতে শুরু করল। সকলে যেন ঘন্টার শব্দ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘন্টার শব্দ শেষ হলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, 'ওই আলোটা খুব নরম। মানে, মোলায়েমভাবে মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে।'

বরেন মল্লিকের মুখ দেখে মনে হল, ব্যাখ্যাটায় তাঁর সায় আছে।

কিন্তু সুপ্রকাশ পালিত উসখুস করছিলেন, বারবার ভূতনাথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ভূতনাথ সিগারেটে মেজাজী টান দিয়ে জগৎ শ্রীমানীকে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন—তবে ওটা ঠিক সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন হল না। আমি একটু ধার করা বিদ্যে জাহির করি। কারণ, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে আমার বিদ্যে শুরু। এটা আমি শুনেছিলাম এক সায়েন্টিস্ট বন্ধুর মুখে।

'কনে-দেখা আলোর মোদ্দা ব্যাপারটা হল, ওই আলোয় কোনও ছায়া পড়ে না। যাকে বলে ডিফিউজ্‌ড লাইট। মানে, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে আলো যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্যেই মুখের ওপর আলোটা নরম মোলায়েম বলে মনে হয়।'

কিছুক্ষণ কেউই কোনও কথা বললেন না। বোধহয় প্রিয়নাথের ব্যাখ্যাটা মনে-মনে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎই সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'রাতের কনে-দেখা আলোর কথা আপনারা কেউ কখনও শুনেছেন কি?'

'তার মানে!' হাই পাওয়ার চশমার কাচের পিছনে সুপ্রকাশ পালিতের চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম বড় দেখাল।

প্রিয়নাথ ম্লান হাসলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, 'আমার তো বেশিরভাগ কাজ-কারবারই রাত নিয়ে। তবে এই ঘটনার শুরু হয়েছিল কনে-দেখা আলো দিয়ে। আর শেষও হয়েছে বলতে পারেন কনে দেখা আলো দিয়ে। তফাতের মধ্যে শুধু এই—প্রথমটা দিনের কনে-দেখা আলো, আর শেষেরটা রাতের।'

'রাতের কনে-দেখা আলো!' অস্ফুটে বললেন বরেন মল্লিক।

'হ্যাঁ, রাতের—' ভূতনাথ বললেন, 'ধরে নেওয়া যাক, ছেলেটির নাম সুজন—

বয়েস আর কত হবে?—এই ছাব্বিশ-সাতাশ। আমার গল্পটা—মানে, সত্যি ঘটনাটা—ওকে নিয়েই। ও তখন ভালো চাকরি করে। মা-বাবা ওর জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। একমাত্র ছেলেকে এবার সংসারী করে দেবেন। ঠিক এইরকম একটা সময়ে ঘটনার শুরু....।'

ধানবাদ থেকে ট্রেনে ফিরছিল সুজন। সঙ্গে মা আর বাপি। মাসিমণির মেয়ের বিয়েতে ওরা চারদিনের জন্য ধানবাদ গিয়েছিল। মায়ের আরও ক'দিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুজন থাকতে চায়নি। কারণ, অফিস থেকে ও মাত্র চারদিনেরই ছুটি পেয়েছে। অফিসে জয়েন করেই ওকে আবার চেন্নাই ছুটতে হবে—অফিসের একটা নতুন প্রজেক্টের মিটিং আছে সেখানে।

বাপিরও অবশ্য বেশিদিন থাকার ইচ্ছে ছিল না। কলকাতায় ব্যবসার কাজ ছেড়ে কোথাও ওঁর মন বসে না। তাই সুজনের মায়ের মন খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল সুজন। বলছিল, ক'মাস পরেই ও ছুটি নিয়ে মাকে ধানবাদ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। এবারে আর চারদিন নয়—কমপক্ষে দশদিন।

মা তবুও মুখ ভার করে বসেছিল।

বাপি কোনও কথা বলেননি। লম্বা সিটের এক কোণে বসে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আর আড়চোখে সুজনদের দেখছিলেন।

সুজনের অনেক কথা গোমরা মুখে শোনার পর শেষে মা বলল, 'তোর জন্যেই আরও দু-দিন থাকতে চেয়েছিলাম—আমার জন্যে নয়।'

'কেন, আমার জন্যে কেন?' সুজন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'রুবিকে তোর জন্যে মেয়ে দেখতে বলেছিলাম। ও একটা মেয়ের খবর দিয়েছিল। দেখতে নাকি দারুণ। কাল বিকেলে ও রুবিদের বাড়িতে আসবে কথা ছিল। তোরা এমন করলি, মেয়েটাকে দেখার আর সময় পেলাম না।'

রুবি সুজনের মাসিমণির নাম। বিয়ের সম্বন্ধ করার ব্যাপারে মাসিমণির উৎসাহ অফুরন্ত। প্রায়ই অহঙ্কার করে বলেন, 'এ পর্যন্ত চোদ্দটা বিয়ের সম্বন্ধ করেছি!'

সুজন মায়ের কাছেই শুনেছে, মাসিমণির টার্গেট নাকি পঁচিশটা সম্বন্ধ। তারপর তিনি এই গুরুদায়িত্বের কাজ থেকে রিটায়ার করবেন। তখন ভারতে বিয়ের হার নির্ঘাত গোঁত্তা খেয়ে নীচে নেমে যাবে।

সুজন জানে, ওর বিয়ের জন্য মা একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মেয়ের ফটো দেখেছে ও— কিন্তু ওর পছন্দ হয়নি।

কোনও-কোনও সময় মাকে ও মিনমিন করে বলেছে, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে। আগে চাকরিতে একটু দাঁড়িয়ে নিই...।'

কিন্তু মা সেসবে আমল দেয়নি। অনুসন্ধান পুরোদমে চলেছে।

মায়ের আক্ষেপটা শোনার পর সুজন মাথা নেড়ে বলল, 'উফ্, তোমাদের কিছু এনথু আছে বটে!'

'কী বললি?' ছেলের কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে মা প্রশ্ন করল।

সুজন বলল, 'না—কিছু না।'

তারপর জানলা দিয়ে বাইরের ছবি দেখতে লাগল।

গাছপালা, মাঠ-প্রান্তর, দিঘি, হাঁস, ফিঙে, ঘুঘু—সব একে-একে ছুটে চলেছে উলটো দিকে। শুধু পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যটা জানলার ফ্রেমে নাছোড়বান্দার মতো আটকে রয়েছে।

কী অপূর্ব ছবি! এ-ছবি কেবল একজনই আঁকতে পারেন।

সুজন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আনমনা হয়ে গিয়েছিল। তাই খেয়াল করেনি, ট্রেন কখন যেন আসানসোল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। চা আর সিঙারাওয়ালাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

আজ রবিবার। তাই ট্রেন বেশ ফাঁকা। সুজনদের উলটোদিকের সিটে জানলার পাশ ঘেঁষে একজন মাত্র যাত্রী বসে আছেন। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। থলথলে চেহারা। ধানবাদ থেকে ওঠার পরই একটা হিন্দি ম্যাগাজিন খুলে বসেছেন।

ট্রেন ছাড়ার হুইস্‌ল দিল। তারপর নড়ে উঠল। ঠিক তখনই সুজন দেখল তিনজনের একটি পরিবার ওদের কিউবিক্‌ল-এর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনজনেরই চোখের নজর পছন্দসই সিট খুঁজছে।

লম্বা সিটটা প্রায় খালি দেখে পরিবারের কর্তা তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই, এখানে এসো—।'

সুজনদের উলটোদিকে ওরা তিনজন বসে পড়ল।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। তাঁর স্ত্রীর বয়েসও মানানসই। আর ওঁদের মেয়ের বয়েস কত হবে? বড়জোর কুড়ি-বাইশ।

মেয়েটির বোধহয় জানলার কাছে বসার ইচ্ছে ছিল। কারণ, সুজন লক্ষ করল, খানিকক্ষণ উসখুস করার পর ও হিন্দি-ম্যাগাজিন-পড়া ভদ্রলোককে নিচু গলায় কিছু একটা অনুরোধ করল।

ভদ্রলোক চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'হাঁ, হাঁ, কিঁউ নহি—।' এবং কষ্ট করে উঠে সিটের একেবারে এ-প্রান্তে এসে বসলেন—যাতে ওরা তিনজন পাশাপাশি বসতে পারে।

সুজন মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখছিল—অনেকটা যেন পাত্রী দেখার চোখে। হলুদ-কালোয় ছাপা চুড়িদার। গলায় সরু চেন। কানে চকচকে পাথরকুচি

বসানো দুল। বাঁ হাতে ঘড়ি। কপালে সরষের দানার মতো টিপ।

গায়ের রং ময়লা। মুখটা সামান্য লম্বাটে। নাক স্পষ্ট। তার ডান পাশে একটা বড় জড়ুল। ঠোঁট কালচে গোলাপী। চিবুকে ছোট্ট টোল রয়েছে।

মেয়েটির চোখ দুটি অতি সাধারণ। তবে চোখের পালক বেশ ঘন এবং লম্বা। মাথায়ও অনেক চুল। আলগা বেণীর বেশ খানিকটা সিটের ওপরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে।

মেয়েটি মোটেই সুন্দরী নয়। তবে সুশ্রী বলা যায় অনায়াসেই। আচ্ছা, সুজন যদি পাত্রী দেখতে যেত তা হলে এই মেয়েটিকে কি ও সত্যি পছন্দ করত? বোধহয় না।

সুজনের এখন এই এক মুশকিল হয়েছে। অবিবাহিতা কোনও তরুণী দেখলেই ওর মন পাত্রী দেখার মাপকাঠিতে তার সৌন্দর্য মাপতে চায়। এ এক অদ্ভুত খেলা। মনকে হাজার বারণ করেও সুজন বাগ মানাতে পারেনি। এ জন্য নিজের ওপরে ওর মাঝে-মাঝে ভীষণ রাগ হয়।

নিজের এই পাগলামিতে সুজন আপনমনেই হেসে ফেলল। ওর খেয়াল ছিল না, তখন ও আনমনাভাবে তাকিয়ে ছিল মেয়েটিরই দিকে।

'হাসছেন কেন?'

সুজন একেবারে হকচকিয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না।

কারণ, মেয়েটিই সামান্য বিরক্ত গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছে। ওর ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখে সন্দেহের ছায়া।

দুজনেরই মা-বাবা পাশে বসা। সুজন খুব বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর মুখ লাল হয়ে গেল। কানে উত্তাপ টের পেল।

কোনওরকমে ও বলল, 'আপনি মনে হয় ভুল বুঝেছেন। আমি আনমনা হয়ে স্কুল লাইফের কথা ভাবছিলাম। তখনকার একটা মজার ব্যাপার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেয়ে গেছে....।'

মেয়েটি এই উত্তরে তেমন খুশি হল বলে মনে হল না। তাই সুজন তাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়ে একটা স্কুলের গল্প শুনিয়ে দিল।

গল্পটা সত্যিই মজার ছিল। তাই মেয়েটিও হেসে ফেলল।

দুই পরিবারের গল্প শুরু হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। কথায়-কথায় জানা গেল মেয়েটির নাম চন্দ্রা। ওদের 'দেশ' আসানসোল। সেখানে এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে ওরা এসেছিল। এখন কলকাতায় ফিরছে। ধানবাদেও ওদের দু-চারজন আত্মীয় আছে। কখনও-কখনও ধানবাদেও ওরা বেড়াতে যায়।

টুকরো-টুকরো কথা হচ্ছিল, চা খাওয়া হচ্ছিল। তারই মধ্যে সুজন লক্ষ করল, মা বারবার ওর দিকে দেখছে। মনে হল যে ইশারায় কিছু একটা জানতে চাইছে। সুজন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

চন্দ্রা তখন ওর জানলার তাকে বাঁ হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে ওর হাতের পিঠের ওপরে চিবুক রেখেছে। দু-চোখ মেলে দেখছে বাইরের দিকে। ওর কয়েক গোছা চুল হাওয়ায় উড়ছে—কখনও কপালে পড়ছে, কখনও চোখের ওপর।

বাইরে তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু তার দীপ্তির আভা থেকে গেছে আকাশময়। এ সময়ে মেঘের যা কাজ তাই করেছে। সূর্যের ভালোবাসায় কুটিকুটি হয়ে রামধনুর নানান রঙ মেখে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরূপ এক আলো সবাইকে তখন সুন্দর করে তুলেছে। গাছপালা, ধানখেত, পুকুর, ইলেকট্রিক-তারে বসে থাকা পাখি—সবই কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

চন্দ্রাকেও তখন অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

এই অসামান্য আলোয় ওকে দেখে সুজন মুগ্ধ হয়ে গেল। ওর বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি মুচড়ে উঠল। কিশোর বয়েসের প্রথম প্রেমের মতো ওর মনে হল, চন্দ্রাকে না পেলে ও বাঁচবে না।

কলকাতায় ফিরেও এই অনুভবটা ওর একটুও পালটাল না। অফিসে জয়েন করে, চেন্নাইয়ে মিটিং-এ গিয়ে, আবার বাড়িতে ফিরে—সবসময় ওর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

এর নাম যদি প্রেম হয় তা হলে মানতেই হবে এ বড় অদ্ভুত প্রেম!

ঠিকানা আদান-প্রদান ট্রেনেই হয়েছিল। সুতরাং বেশ কিছুদিন উদাসভাবে ছটফট করে কাটানোর পর সুজন একদিন চিঠি লিখল চন্দ্রাকে।

প্রথম চিঠিটা ছিল নির্দোষ বন্ধুত্বের চিঠি। উত্তরও এল অনেকটা সেইরকম।

কিন্তু ধীরে-ধীরে চিঠিগুলোর রং বদলাতে লাগল। সুজন আর চন্দ্রার নিয়মিত দেখা হতে লাগল। এক রহস্যময় টান সুজনকে চন্দ্রার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে চাইল।

মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে-মনে খুশি হয়েছিল। তবে আক্ষেপের একটা ছোট্ট খোঁচা তাকে কখনও-কখনও বিরক্ত করছিল : চন্দ্রার চেয়ে সুন্দরী বেশ কয়েকটি মেয়েকে সুজন এর আগে নাকচ করেছে। যদিও তাদের বংশমর্যাদা, ধনসম্পদ, ইত্যাদি ছিল অনেক উঁচু মানের।

কিন্তু প্রেম কখনও অভিভাবকদের ইচ্ছেমতন পথ চলে না। সুতরাং, দুই পরিবারের সমঝোতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। এবং বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

ঠিক এইরকম একটা সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

চন্দ্রারা সপরিবারে রাতারাতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

নিরুদ্দেশই বলা যায়, কারণ সুজন একদিন ওদের বেলঘরিয়ার বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে ওদের দরজায় তালা ঝুলছে।

আশপাশে খোঁজখবর করে স্পষ্ট কিছু জানা গেল না। দু-একজন ভাসা-ভাসা

ভাবে বললেন যে, ওদের কোন এক আত্মীয় নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই খবর পেয়ে ওরা তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে।

এর বেশি আর কোনও খবর জোগাড় করতে পারল না সুজন। ভাঙাচোরা মন নিয়ে ফিরে এল। ওর রঙিন হয়ে ওঠা জীবনটা চোখের পলকে সাদা-কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে সুজনের দিন কাটতে লাগল। অবশ্য দিন না বলে সেগুলোকে রাত বলাই ভালো। চন্দ্রার কোনও খবর পাওয়া গেল না, কোনও চিঠিও এল না। সুজনের মা-বাপি ধাক্কাটা ধীরে-ধীরে সামলে নিতে পারলেও সুজন পারল না। ও কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। অফিসের কাজে আরও বেশি করে ডুবে গেল। আগ বাড়িয়ে অফিসের ট্যুরে যেতে লাগল, আর চলার পথে তিনটে চেনা মুখকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগল। চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েও ও ঠিক যেন ছাড়তে পারেনি।

প্রায় একবছর পর চলন্ত ট্রেনের কামরায় বিবাগী সুজন হঠাৎই চন্দ্রার বাবা অপরেশবাবুকে দেখতে পেল।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে অপরেশবাবুর!

সারা মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। গাল চুপসে গেছে। চোখ গর্তে বসা। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। গায়ের রং আগের তুলনায় অনেক কালচে হয়ে গেছে। মাথার চুলের চেহারা দেখে মনে হয় বহুদিন তাতে তেল-জল পড়েনি।

অপরেশবাবুকে দেখেই চন্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল সুজনের। উঃ, কতদিন..... কতদিন পর চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়কে সুজন দেখতে পেল!

সুজন পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে দিল্লি থেকে ফিরছিল। অফিস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের সুযোগ থাকলেও ও সেকেন্ডক্লাসে যাতায়াত করে। চন্দ্রারা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে ও এই অভ্যেসটা রপ্ত করেছে। ওর মনে অদ্ভুত এক আশা ছিল: যদি আচমকা কোনও ট্রেনে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দিল্লির ট্রেন ধানবাদ আসানসোল ছুঁয়ে যায়। তাই অফিস থেকে ও প্রায়ই দিল্লি ট্যুরের দায়িত্ব চাইত।

এবারে ট্যুর সেরে ফেরার পথে ট্রেন যখন ধানবাদে দাঁড়িয়েছে তখন ও বরাবরের মতোই জানলা দিয়ে চঞ্চল চোখ মেলে ধরেছে, আর্তের মতো খুঁজেছে একটা চেনা মুখ—কিন্তু বরাবরের মতোই হতাশ হয়েছে।

ট্রেন প্রায় পাঁচ ঘন্টা লেটে চলছিল। সহযাত্রীরা অনেকেই বিরক্তির মন্তব্য করছিল। সুজনের সেগুলো কানে ঢোকেনি। ও চোখ বুজে বিভোর হয়ে চন্দ্রার কথা ভাবছিল।

আচমকা অপরেশবাবুকে চিনতে পেরে সুজনের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে।

কামরার দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটা শূন্য চোখে চেয়ে আছে

একটা সিলিং ফ্যানের দিকে। ওঁর পায়ের কাছে একটা বড় থলে।

'মেসোমশাই!' ওঁর কাছে গিয়ে ডাকল সুজন।

অপরেশবাবু চমকে উঠে তাকালেন সুজনের দিকে। কামরার মলিন আলোয় ঝাপসা নজরে ওকে ঠাহর করতে চাইলেন।

'মেসোমশাই, আমি সুজন। মাসিমা কেমন আছেন? চন্দ্রা কেমন আছে?'

অপরেশবাবু সুজনকে চিনতে পেরে বিব্রত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, চোখ নামিয়ে বসে রইলেন অপরাধীর মতো।

সুজন বসে পড়ল ওঁর পাশে : 'এ কী চেহারা হয়েছে আপনার! চন্দ্রা, মাসিমা.... ওঁরা কেমন আছেন?'

অপরেশবাবু আর সামলাতে পারলেন না। বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে উঠে আসা একটা কষ্ট ওঁকে ভেঙেচুরে দিল। শীর্ণ হাতে সুজনের হাত চেপে ধরে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। কিছু একটা বলতে চেয়েও যেন বলতে পারছিলেন না—শুধু ঠোঁট বেসামালভাবে কাঁপছিল, চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল পলকে।

অনেকগুলো নীরব মুহূর্ত এইভাবে কেটে গেল।

সুজন মানুষটাকে সময় দিল। অনেক প্রশ্ন ওর মনে ভিড় করে এলেও ও চুপ করে রইল।

নিজস্ব তালে শব্দ তুলে ট্রেন ছুটে চলেছে। বাইরের অন্ধকার ভেদ করে তীরের মতো ছুটে আসছে বাতাস। বাতাসে সামান্য ঠান্ডা ভাব। শীত আর বেশি দূরে নেই।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলতে পারলেন অপরেশবাবু।

মালবাজারে ওঁর ছোট ভাইয়ের হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক হয়। তার সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ওঁরা তিনজনে ছুটে যান শিলিগুড়ি। শহর থেকে প্রাইভেট কারে করে মালবাজারে যাওয়ার পথে একটা ট্রাকের সঙ্গে ওঁদের গাড়ির মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। চন্দ্রা, চন্দ্রার মা—দু-জনেই সাঙ্ঘাতিকরকম চোট পায়। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। তারপর বহু কষ্ট করে, ডাক্তার-হাসপাতাল, জড়িবুটি-কবিরাজ, ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র করে কোনওরকমে শেষ রক্ষা হয়। অপরেশবাবুর বাঁ হাতটা ভেঙে গিয়েছিল, তা ছাড়া মাথাতেও চোট পেয়েছিলেন। সেসব সামলে ওঠার পর কারও সঙ্গে তিনি আর যোগাযোগ করেননি—যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতিও ছিল না। তাই ওঁরা একরকম অজ্ঞাতবাসে চলে যান। আসানসোলের এক নির্জন প্রান্তে গিয়ে নতুন ঠিকানায় থাকতে শুরু করেন। অপরেশবাবু একসময় গিয়ে কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে আসেন। তারপর থেকে সম্পর্কের সব ডালপালা ছিন্ন করে ওঁরা একান্তে চুপিচুপি দিন কাটান।'

'...এ আমাদের নিজেদের দুনিয়া, সুজন। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না....এখান থেকে কেউ চলে যেতেও পারে না......।' বুক ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু।

ওঁর কাহিনীর সবটুকু সুজনের কাছে স্পষ্ট হয়নি। কেন ওঁরা আত্মগোপন করে রয়েছেন? তা হলে কি দুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর মাসিমার মুখ বীভৎস কুৎসিত ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে! এমন কী হয়েছে, যে ওরা এরকম চোরের মতো মুখ লুকিয়ে বসে আছে!

সুজন ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। চন্দ্রাকে একটিবার দেখার জন্য ওর অন্তরাত্মা ছটফট করছিল।

আর থাকতে না পেরে ও বলল, 'আমি...আমি চন্দ্রার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'না, তা আর হয় না।' শীর্ণ অবসন্ন অপরেশবাবু ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন।

'মেসোমশাই, প্লিজ! আপনি জানেন না, এই একটা বছর আমি কীরকম পাগলের মতো আপনাদের খুঁজে বেড়িয়েছি! অফিসের টুরে সবসময় সেকেন্ড ক্লাসে ট্র্যাভেল করি শুধু এই আশায় যে, কোনদিন হুট করে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সত্যিই...দেখা হল তো!' সুজন কেঁদে ফেলল। কনে-দেখা আলোয় প্রথম চন্দ্রাকে দেখার অপরূপ ছবিটা ওর বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ করেই চলে এল চোখের সামনে।

ও কিছুতেই কান্না চাপতে পারছিল না। এতদিনের কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা যেন এই প্রথম অন্ধকার কুঠরী থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

অকালবৃদ্ধ মানুষটার হাত আঁকড়ে ধরে ভাঙা গলায় সুজন বলল, 'একটিবার....মেসোমশাই, প্লিজ.....একটিবার....।'

আকুল যুবকটির কান্না-ভেজা চোখে অপরেশবাবু কী দেখলেন কে জানে! নরম গলায় বললেন, 'চলো। কিন্তু চন্দ্রা কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে?'

'কেন, দেখা করতে চাইবে না কেন!'

'ও....ও অনেক....বদলে গেছে....।'

কেমন বদলে গেছে চন্দ্রা? দুর্ঘটনায় ওর চেহারা বদলে গেছে? নাকি মনটা?

সুজন শত ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। এলোমেলো বহুরকম ভাবনা ওর মনের ভেতরে উথালপাথাল করতে লাগল।

এরকম একটা মনের অবস্থা নিয়ে আসানসোল স্টেশনে নামল সুজন। স্টেশনের বাইরে এসে ওরা একটা সাইকেল রিক্সায় উঠে বসল।

জ্যোৎস্নার রাত। কালো ভেলভেটের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। কারও কাছে কিছু ধার করে সেটা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া বড় সহজ নয়। অথচ চাঁদ হাসি-মুখে ধার করা আলো বিলিয়ে চলেছে।

সাইকেল রিক্সা ছুটছিল। বাতাসে সামান্য শীত-শীত ভাব। সুজন বেশ গুটিসুটি মেরে বসল। অপরেশবাবু আপনমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন। কোনও কথা বলছিলেন না।

শুরুতে একবার শুধু বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'তুমি ওদের সঙ্গে দেখা না করলেই ভালো করতে। কিন্তু তুমি যেভাবে জেদ ধরেছ....। অবশ্য তোমার কষ্টটাও আমি বুঝি....।'

জনপদ ক্রমশ কমছিল। রাস্তায় লোকজন আঙুলে গোনা যায়। সাইকেল রিক্সাও চোখে পড়ছে কম। শুধু সুজনদের নিয়ে এই রিক্সাটা একঘেয়েভাবে ছুটে চলেছে। কখন থামার সময় আসবে কে জানে!

একসময় পিচের রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হতেই রিক্সা থামালেন অপরেশবাবু। রিক্সা থেকে নেমে ওঁরা হাঁটা পথ ধরলেন।

হাঁটা পথ একসময় শেষ হল। টিনের চাল দেওয়া বড়সড় একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে অপরেশবাবু আলতো গলায় বললেন, 'এসো, সুজন—আমরা এখন এখানেই থাকি।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই কেমন অদ্ভুত লাগল সুজনের। ঠান্ডার কামড়টা বাইরের চেয়ে যেন বেশি। আর হালকা ন্যাপথালিনের গন্ধে পরিবেশটা ভারি হয়ে রয়েছে।

বড় মাপের বসবার ঘর। তার চারটে জানলাই হাট করে খোলা। এদিক-ওদিক ছিটকে পড়া চাঁদের আলো চোখে পড়ছে। আর ঘরের আলো এতই কম যে, চাঁদের আলোর সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিচ্ছে।

'এত কম আলো....আপনাদের অসুবিধে হয় না?' সুজন অবাক হয়ে বলল।

'অসুবিধে?' শব্দ করে সামান্য হাসলেন অপরেশবাবু। ওঁর মুখে ছায়া পড়ায় হাসিটা দেখা গেল না : 'আলো না থাকলেই বরং আমাদের সুবিধে হয়। ওরা তো একদম আলো সহ্য করতে পারে না। আমিও আস্তে-আস্তে ওদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

সুজনের মনের ভেতরে হঠাৎই কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল। ওর চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে চন্দ্রাকে, মাসিমাকে খুঁজল।

সেটা লক্ষ করে অপরেশবাবু বললেন, 'তুমি বোসো—আমি ওদের ডাকছি।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসল সুজন। কিন্তু কাঠের চেয়ারটা ভীষণ ঠান্ডা। ও বেশ অবাক হয়ে গেল। হাতের ব্রিফকেসটা নামিয়ে রাখল একপাশে।

অপরেশবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই মাসিমা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কী জমকালো সাজে সেজেছেন তিনি! ম্লান আলোতেও সেই সাজ গ্লো-সাইনের মতো ঝকমক করছে।

গাঢ় হলুদ রঙের জরিপাড় শাড়ি। দু-হাত ভরা গয়না। গলায় জড়োয়া হার। কানে চকচকে দুল। নাকে নাকছাবি। কপালে বড় টিপ। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর।

যেন একেবারে নতুন বউ।

মাথায় ঘোমটা টেনে শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে সুজনের কাছাকাছি বসলেন মাসিমা।

'কেমন আছ, সুজন?'

সুজন বিহ্বল চোখে চন্দ্রার মাকে দেখছিল, কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল : 'ভালো আছি।'

'মেসোমশাইয়ের কাছে আমাদের বিপদ-আপদের কথা সব তো শুনেছ।'

সুজন আবার ঘাড় নাড়ল।

এতদিন পর দেখা হল, অথচ মাসিমার মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস নেই। যেন আগে থেকেই জানতেন, সুজন আজ দেখা করতে আসবে।

'কেমন আছেন, মাসিমা?'

'ওই একরকম...।'

'চন্দ্রা কেমন আছে?'

বিষণ্ণ হাসলেন মাসিমা : 'ওই আমারই মতন।'

ঘরের আলোটা কমজোরী হলেও সরাসরি মাসিমার মুখের ওপরে গিয়ে পড়েছিল। সুজন মুখটাকে আগের চেনা মুখের সঙ্গে মনে-মনে মিলিয়ে দেখছিল।

মুখের চামড়া তেলতেলে টানটান। দু-চোখ ছবির মতো সুন্দর। মাসিমার মুখটা হয়তো এরকমই ছিল, তবে এখন অনেক সজীব আর নবীন দেখাচ্ছে।

সুজনের ছৌ-নাচের মুখোশের কথা মনে পড়ল।

মাসিমার টুকটাক কথা বলার মধ্যেই অপরেশবাবু সুজনের জন্য এক কাপ চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে প্লেট নেই, বিস্কুট নেই।

সব মিলিয়ে দৃশ্যটা সুজনের কেমন খাপছাড়া লাগল। মাসিমা, চন্দ্রা থাকতে অপরেশবাবু হঠাৎ চা করতে গেলেন কেন! তা ছাড়া ওঁদের অবস্থা কি এখন এতই খারাপ যে, অতিথির কপালে প্লেট বা বিস্কুটও জোটে না!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুজন ন্যাপথালিনের গন্ধ পেল। এই বিশ্রী গন্ধটা ওঁরা কী ভাবে সহ্য করছেন কে জানে!'

'সব কাজ আমাকে একার হাতেই করতে হয়...' হাতে হাত ঘষে অনেকটা যেন কিন্তু-কিন্তু ভাবে অপরেশবাবু বললেন, 'ওরা ঠিক পারে না....।'

অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। চন্দ্রার কথাও হল। সুজনের মা-বাপির খোঁজ নিলেন মাসিমা। কিন্তু ওঁর কথায় উষ্ণতার কোনও ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাচ্ছিল না সুজন। টিভিতে যাঁরা খবর পড়েন মাসিমা যেন ঠিক তাঁদের মতন করে কথা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ পর যখন কেউ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না তখন ভেতরে-ভেতরে অধৈর্য হয়ে ওঠা সুজন জিগ্যেস করল, 'চন্দ্রা কোথায়, মাসিমা? ওর সঙ্গে একটু দেখা করব...।'

'দেখা করবে করো। ও বাইরের বাগানে বসে আছে।' নির্লিপ্তভাবে এই কথা বলে বাড়ির পিছন দিকটা ইশারায় দেখালেন মাসিমা।

অপরেশবাবু সুজনকে ডাকলেন, 'এসো, আমার সঙ্গে এসো—।'

একটা ছোট ঘর এবং রান্নাঘর পেরিয়ে বাড়ির খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে গেল সুজন। অপরেশবাবু দরজা খুলে বাইরে বেরোলেন, ওকেও ডেকে নিলেন।

সামনে প্রায় বিঘেখানেক জমি। তার এখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে নানান জাতের গাছ বড় হয়ে উঠেছে। তবে একপাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে কয়েকটা বেদী চোখে পড়ছে। হয়তো অপরেশবাবুই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছেন।

সবক'টা বেদী খালি—শুধু একটি ছাড়া। সেখানে ছায়া-ছায়া কেউ একজন বসে আছে।

'চন্দ্রা—।' অপরেশবাবু চাপা গলায় ডাকলেন।

নিচু গ্রামের সেই ডাক চন্দ্রা দিব্যি শুনতে পেল, সামান্য ঘাড় ফেরাল সুজনদের দিকে।

'তুমি যাও—কথা বলো।' সুজনকে আলতো করে ঠেলে দিলেন অপরেশবাবু। তারপর ফিরে চলে গেলেন বাড়ির ভেতরে। চন্দ্রার সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে সুজন খানিকটা হালকা হবে।

কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সুজন এক পা-দু-পা করে এগিয়ে চলল চন্দ্রার দিকে। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা ঘাসের ছোঁওয়া ওর শরীরে একরকম শিরশিরানি জাগিয়ে তুলছিল। এক ঝাঁক পাখির মতো উড়ে এসে রাতের বাতাস সুজনের চোখে-মুখে ঝাপটা মারল।

এক টুকরো মেঘ কোথা থেকে ভেসে এল। পূর্ণিমার চাঁদকে সেটা ঢেকে দিতেই কটকটে জ্যোৎস্নার আলোছায়া উধাও হয়ে গেল। এক পরিব্যাপ্ত ঘষা আলো মোলায়েমভাবে ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে।

সুজনের কনে-দেখা আলোর কথা মনে পড়ে গেল।

ও পায়ে-পায়ে পৌঁছে গেল সেই বেদীর কাছে। চন্দ্রার কাছ থেকে হাতদুয়েক দূরত্বে বসে পড়ল।

চন্দ্রার সাজপোশাক সুজনকে মোটেই অবাক করল না। কারণ, একটু আগেই ওর মায়ের জমকালো সাজ ও দেখেছে। তবে চন্দ্রার সাজ যেন হুবহু মায়ের মতন—এমনকী ঘোমটাটা পর্যন্ত!

চন্দ্রার পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, যদিও চাঁদের আলোয় রংটা ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। সারা গায়ে গয়না। খোঁপার পাশ থেকে ফুলের মালা ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে ঘোমটা টানা। আর ঘোমটার ভেতরে চন্দ্রার টলটলে মুখ।

'চন্দ্রা!' আবেগমথিত গলায় ডেকে উঠল সুজন। ন্যাপথালিনের গন্ধটা তখনও

ওর নাকে আসছে।

চন্দ্রা ওর ডাকে মুখ ফেরাল। কোনও কথা বলল না।

চন্দ্রার মাথায় ঘোমটা কেন! ওর কি তা হলে বিয়ে হয়ে গেছে! কিন্তু কপালে বা সিঁথিতে তো সিঁদুরের ছোঁওয়া চোখে পড়ছে না!

'চন্দ্রা, এই একটা বছর আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজেছি। যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার কথা তোমার মনে পড়েনি?'

'পড়েছে।' আবেগহীন গলায় বলল চন্দ্রা, 'কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। তুমি আমাকে খুঁজে পাও......আমাদের খুঁজে পাও....আমরা চাইনি। কিন্তু সবই নিয়তি! নইলে বাবার সঙ্গে আচমকা তোমার দেখা হবে কেন!'

এ কোন চন্দ্রা! এ রকম কোনও চন্দ্রাকে তো সুজনের মনে পড়ছে না!

'আমি এখনও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, চন্দ্রা.....।'

'অপেক্ষা!' খিলখিল করে হাসল চন্দ্রা : 'আমার সব অপেক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এবার চলে যাও।'

অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকাল সুজন। চন্দ্রা ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছে! ও তো ভেবেছিল রাতটা এখানে থাকবে। তারপর কাল সকালে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে তবে ফিরবে!

চন্দ্রাকে হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ সুজনের অন্যান্য চেতনা আর বোধ আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। ও হতবাক হয়ে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাতের বাতাস হঠাৎই যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। গাছের পাতা শিরশির শব্দ তুলল। জোনাকীরা এদিক-ওদিক উড়ছে। আর টলটলে জ্যোৎস্নার অপরূপ কনে-দেখা আলো রাতকে আরও সুন্দর, আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে।

ঘোমটার আড়ালে চন্দ্রাকে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতেই মাতাল হয়ে গিয়েছিল সুজন। ও সামনে ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রার একটা হাত মুঠো করে ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল চন্দ্রা। এক ঝটকায় হাত টেনে নিতে চাইল। বাতাসের ঝাপটায় ওর ঘোমটা খসে গেল।

'এসব কী করছ! তুমি চলে যাও!'

অবাক হয়ে সুজন হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। তবে চন্দ্রাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। দেবী প্রতিমার মতো মসৃণ তেলতেলে মুখ চাঁদের আলোয় অনন্য হয়ে উঠেছে।

'চন্দ্রা!' আবার ডেকে উঠল সুজন, 'আমি চলে যাওয়ার জন্যে আসিনি।' ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠছিল।

হঠাৎই পিছন থেকে অপরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল : 'তুমি চলে যাও, সুজন। তাতে সবার ভালো হবে।'

চমকে মুখ ফেরাতেই অপরেশবাবুকে দেখতে পেল সুজন। পাশে দাঁড়িয়ে মাসিমা। ওঁরা কখন যেন নিঃশব্দে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'আজ রাত্তিরটুকু থেকেই কাল সকালে চলে যাব, মেসোমশাই।' অনুনয়ের সুরে বলল সুজন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু। বিব্রতভাবে বললেন, 'তুমি আজ রাতেই চলে যাও—।'

'কেন?'

'আমাদের এখানে রাতে কেউ থাকে না।' একটু থেমে তারপর : 'শুধু আমরা তিনজনে থাকি।'

অপরেশবাবুর শেষ কথাটা জ্যোৎস্নারাতে নিশাচর পাখির মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াতে লাগল। ওদের ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল : শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে.....।'

সুজন উঠে দাঁড়াল। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না এখন কী করবে। রাতের আঁধার, বাতাস, জোনাকীর দল, গাছ-গাছালি, আর এই তিনজন রহস্যময় মানুষ ওকে কেমন যেন দিশেহারা করে দিচ্ছিল।

মাসিমা মেসোমশাইয়ের হাত ধরে টানলেন। ওঁরা গিয়ে বসলেন বেদীতে, চন্দ্রার পাশে। মেসোমশাই মাঝখানে—ওঁর দু-পাশে ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে। ওঁদের বসার ঢঙটা এমন যেন স্টুডিওতে বসে গ্রুপ ফটো তোলার পোজ দিচ্ছেন।

চাঁদের সামনে থেকে মেঘের আড়াল হঠাৎই সরে যেতে জ্যোৎস্নার তীব্র আলো-ছায়া আবার ফিরে এল।

তখন সুজন দেখল, চন্দ্রার মুখে জড়ুলটা আর নেই। ওটা কোথায় গেল! অ্যাক্সিডেন্টের পর কি প্লাস্টিক সার্জারিতে বাদ গেছে!

ও অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অপরেশবাবু হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করলেন।

'চন্দ্রাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে—দেখেছ, কথাও বলেছ। এবার তুমি যাও, সুজন। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। তবে জেনে রেখো, আমরা আরও কষ্টে আছি।'

বাতাস হঠাৎই আরও অস্থির হয়ে উঠতেই মাসিমার ঘোমটা খসে পড়ল। মাসিমা আর চন্দ্রার খোঁপা কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় খুলে গেল। বাতাসে ওদের এলো চুল পাগলের মতো উড়তে লাগল—চাঁদের আলোয় চিকচিক করতে লাগল।

অপরেশবাবু স্ত্রী আর মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি যেভাবে ওদের ফিরিয়ে এনেছি তা কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে এ তো ঠিক ফিরিয়ে আনা নয়—চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা। দু-জগতের মাঝখানে। আর আমি?' বিষণ্ণ আক্ষেপের এক শব্দ করলেন অপরেশবাবু : 'আমি ওদের দুজনের পাহারাদার হয়ে দিন কাটাচ্ছি।'

'তোমাকে আমরা ভালোবাসি।' চন্দ্রা আর মাসিমা একইসঙ্গে বলে উঠলেন।

'জানি। আর জানি বলেই তো এত কষ্ট করেও টিকে আছি।'

'আমিও আপনাদের সঙ্গে কষ্ট করে টিকে থাকব।' বায়না করার সুরে বলল সুজন।

অপরেশবাবু হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন : 'তুমি তো কিছুতেই বুঝতে চাইছ না! তা হলে দ্যাখো—' স্ত্রী আর মেয়ের কানে-কানে কী যেন বললেন অপরেশবাবু।

মাসিমা আর চন্দ্রা খিলখিল করে হেসে উঠলেন—হাসতেই থাকলেন। আর একইসঙ্গে ওঁদের ডান হাতটা তুলে নিয়ে গেলেন ডান চোয়ালের নীচে।

এরপর সুজন যা দেখেছিল তা সত্যি হলেও পরে কখনও সেটাকে ও সত্যি বলে মানতে পারেনি। কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভুল দেখার কোনও অবকাশ ছিল না।

চন্দ্রা আর মাসিমা—দুজনেই ওঁদের মুখ দুটো খুলে নামিয়ে নিলেন। মুখ নয়, মুখোশ। সুজন দেখল, ওঁদের মুখের জায়গাটায় একরাশ অন্ধকার।

ন্যাপথালিনের উৎকট গন্ধে সুজনের দম বন্ধ হয়ে এল। রাতের বাতাস হঠাৎই যেন আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা ঘোরের মধ্যেই ও শুনতে পেল নিশাচর কোনও পাখির কান্না।

দুটো অন্ধকার মুখের পিছনে বিশাল কালো পতাকার মতো ওঁদের চুল উড়ছিল। সেই পটভূমিতে অপরেশবাবুর মুখটা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। স্ত্রী আর মেয়েকে আঁকড়ে কাছে টেনে নিলেন তিনি।

ওঁদের খিলখিল হাসির শব্দ তখনও থামেনি।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আগে অপরেশবাবুর শেষ কথাটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল সুজনের কানে।

'......সেইদিন থেকে দুজন অন্ধকারকে নিয়ে আমি বাস করি। আমার মেয়ে-অন্ধকার, আর বউ-অন্ধকার। এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কারও ঠাঁই নেই.....।'



ছায়াবন্দি খেলা

'মিস্টার জোয়ারদার, আপনার কাছে কোনও অলৌকিক সমস্যা নিয়ে আমি আসিনি। ভূত-প্রেতের ব্যাপারে কোনও সাহায্যও চাইতে আসিনি।' একটু থামলেন ভদ্রলোক। বোধহয় পরের কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিতে চাইছিলেন। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে ঘন-ঘন তিনটে টান দিয়ে শেষ টুকরোটা খুব সাবধানে অ্যাশট্রের গায়ে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। তারপর সেটা অ্যাশট্রের গর্তে ফেলে দিয়ে কুলকুল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। ঘরে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হয়ে গেল।

সেই মেঘের দিকে মুখ তুলে অবশ চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। যেন অপূর্ব এক রামধনু তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

মেঘ ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। তখন ভদ্রলোক আনমনাভাবে বিড়বিড় করে বললেন, 'বলতে গেলে এরকমই এক ধোঁয়ার গল্প আপনাকে আমি শোনাতে এসেছি। তবে সেটা সাদা ধোঁয়া নয়—কালো ধোঁয়া। ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘও বলতে পারেন।'

প্রিয়নাথের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল।

ভদ্রলোকের নাম অশেষ শিকদার। এয়ারপোর্টে চাকরি করতেন—বছরচারেক হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে রনিত বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এ করণিক। প্রায় আট বছর হল বিয়ে করেছে। তিন-সাড়ে তিন বছরের একটি মেয়েও আছে।

অশেষবাবুর মেয়ে প্রমিতা পাস কোর্সে বি. এসসি. পাশ করে বসে আছে। ঘরকন্নার কাজে মাকে সাহায্য করে আর গোটাচারেক টিউশানি করে।

ওঁরা সবাই থাকেন কৈখালিতে। রিটায়ার করার পর অশেষবাবু সেখানে বাড়ি করেছেন। মোট ছ'জন মানুষ নিয়ে ওঁদের পরিবার বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু গত অগ্রহায়ণের এক অমাবস্যার রাত থেকে ওঁদের জীবনের ছকটা পালটে গেছে। ওঁদের সুখ-শান্তির সাজানো ঘুঁটিগুলো কেউ যেন কাঠের একটা কৌটোয় ভরে পাগলের মতো ঝাঁকিয়ে তারপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়েছে।

অশেষ শিকদার ক'দিন ধরেই প্রিয়নাথকে ফোন করে দেখা করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তার ধরন খুব স্বাভাবিক মনে না হওয়ায় প্রিয়নাথ দেখা করতে চাননি—বরং এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।



কিন্তু একদিন ভদ্রলোক টেলিফোনে এমন একটা কথা বললেন যে, প্রিয়নাথ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সেই কথাগুলো এই মুহূর্তেও প্রিয়নাথের কানে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছিল।

অশেষবাবু আহত গলায় বলেছিলেন, 'প্রিয়নাথবাবু, বুঝতে পারছি আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কারণ, আমার কথাবার্তা বোধহয় খুব একটা নরমাল নয়। আপনাকে একটা কথা বলতে পারি—আমি পাগল নই। কিন্তু আমার জীবনে যে-ঝড় বয়ে গেছে তাতে যে-কোনও মানুষই পাগল হয়ে যেত। আমি যে কেন হইনি সেটাই আশ্চর্যের।' বিষণ্ণ হাসি হেসেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর : 'বোধহয় আপনাকে সেই ঘটনাগুলো বলার জন্যেই আমি এখনও সুস্থ অবস্থায় বেঁচে রয়েছি। নইলে বহুদিন আগেই তো আমার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা! যাই হোক, এটুকু আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এরকম বিচিত্র ঘটনা আপনি জীবনে কখনও শোনেননি...।'

সেই বিচিত্র ঘটনা শোনার জন্যই প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় ওঁকে বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেছেন।

অশেষ শিকদার যখন এসে হাজির হলেন তখন সওয়া ছ'টা মতন হবে। ভূতনাথ ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আজ একটু আগেভাগেই সন্ধেবেলার পুজো-আর্চার কাজ সেরে নিয়েছিলেন। তারপর অগোছালো বসবার ঘরটাকে একটু-আধটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মেঝেতে ঢলে পড়া বইপত্র আর ম্যাগাজিনগুলো যতটা সম্ভব থাকে-থাকে সাজিয়ে নিয়েছেন।

ব্যাচিলারদের ঘরের একটা বিশেষ চরিত্র থাকে। সেটা অনেকটা যেন ছন্নছাড়া স্বাধীনতার ছাপ। আর যারা সংসারী, তাদের সংসার পরিপাটি সাজানো-গোছানো হলেও কোথায় যেন একটা পরাধীনতার রেশ থেকে যায়। অন্তত প্রিয়নাথ তাই মনে করেন। তাই নিজের ঘরটাকে তিনি কখনও খুব ছিমছাম করে সাজান না—পাছে তার মধ্যে পরাধীনতার ভেজাল ঢুকে পড়ে।

অশেষবাবু এসে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর বংশলতিকার অল্পবিস্তর বিবরণ দিয়েছেন। প্রিয়নাথ তাতে বিরক্ত হননি। কারণ, আসল রসের সন্ধান পেতে হলে অনেকটা নীরস পথ পেরোতে হয়—প্রিয়নাথের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। সুতরাং তিনি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। অশেষবাবুকে একটানা কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন। আর মানুষটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

চেহারা রোগার দিকে হলেও স্বাস্থ্য খারাপ নয়। গায়ের রং ময়লা। গাল সামান্য বসা। কাঁচা-পাকা সরু গোঁফ। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা আর তার বেশির ভাগটাই সাদা। কপালে একটা শিরা উঁচু হয়ে রয়েছে। ওপর-ওপর দেখে ব্লাড সুগারের রুগি বলে মনে হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষ করার মতো জিনিস হল চশমার কাচের আড়ালে ওঁর চোখ দুটো। সরু লম্বাটে মুখে অস্বাভাবিক বড়-

বড় দুটো চোখ যেন ভীষণরকম বেমানান। তার ওপর ভয়ে কিংবা কৌতূহলে চোখের মণি দুটো সবসময়েই অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আবার হঠাৎ করেই কোনও কিছুর দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে।

ছোট্ট করে বারতিনেক কাশলেন অশেষবাবু। তারপর বলতে শুরু করলেন ওঁর বিচিত্র কাহিনী।

আমার বাড়িটা কৈখালির দশদ্রোণ এলাকায়। দু-কাঠা জমির ওপরে ছোট্ট একতলা বাড়ি। জমির ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা সুপুরি গাছ আর একটা পেয়ারা গাছ আছে। পেয়ারা গাছটায় ভোরের দিকে কিংবা বিকেলের দিকে দু-চারটে পাখি-টাখি আসে—বসন্তবৌরি, বুলবুলি, কাঠঠোকরা—এছাড়া শালিক-চড়ুই তো আছেই।

বাড়ি আমার হয়তো কোনওদিনই করা হয়ে উঠত না, যদি না হঠাৎ করে লাল্টুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যেত। লাল্টু ওই এলাকারই ছেলে—'ত্রিবেণী এন্টারপ্রাইজ' নামে ওর একটা কোম্পানি আছে—কন্সট্রাকশনের কাজ করে। ওর সঙ্গে রয়েছে এক ঝাঁক তরতাজা যুবক বিশ্বজিৎ, বাচ্চু, পল্টু, দেবাশিস, আরও অনেকে। এলাকায় কোনও উৎসব হলে ওরা সবার আগে হইহই করে মেতে ওঠে। আবার কারও অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে সবার আগে ওরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে—ঝড়-বৃষ্টি রাত-বিরেতের তোয়াক্কা করে না।

লাল্টু আমাকে ধারে জমির মালিক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ধারে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। আমি কোনওরকমে টাকার জোগাড় করে ওকে কিস্তিতে-কিস্তিতে শোধ দিয়েছি। বাড়িতে আমি আছি আজ চারবছর, কিন্তু ওর ধার এখনও শোধ করতে পারিনি—সামান্য কিছু বাকি আছে। আমি মনে-মনে জানি, ওর টাকা হয়তো আমি শোধ করে দেব, কিন্তু ওর ঋণ সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না।

লাল্টুর কথা এত করে বলছি তার কারণ, আমার এই বিপদেও ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে প্রাণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল—কিন্তু পারেনি। বোধহয় পারা সম্ভব ছিল না বলেই।

গত বছর অগ্রহায়ণ মাসের এক বিকেলে আমি বাড়ির বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিলাম। শিবানী, মানে বউমা, ওর মেয়ে মুনমুনকে নিয়ে পেয়ারা গাছের নীচটায় বসে ছিল। আমার স্ত্রী বনানী বাড়ির ভেতরে টুকিটাকি কাজ সারছিল। ছেলে রুনু তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। সাধারণত ও সাতটা নাগাদ ফেরে। আর প্রমি বাড়ি ছিল না—টিউশানিতে গিয়েছিল।

পাখি দেখাটা আমার শখ। তাই পেয়ারা গাছটার ডালপালার দিকে তাকিয়ে

ছিলাম। দুটো বুলবুলি সেখানে খেলা করছিল।

সূর্য একটু আগে ডুবে গেছে। সময়টা গোধূলি মতন। শীতের বাতাস সবে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করেছে। তা ছাড়া আমার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা বড় পুকুর আছে। সন্ধের পর সেদিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসে। সেদিন বাতাসটা একটু যেন বেশিই ঠান্ডা ছিল।

হঠাৎই আমার চোখে পড়ল একটা ছোট মেঘের টুকরো যেন আমার বাড়ির দিকে ভেসে আসছে।

সাধারণ মেঘের মতো হলে ব্যাপারটা আমার চোখ টানত না। কিন্তু ওটার ভেতরে একটা কিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন কালো মেঘের ভেতরে একটা আরও কালো মেঘের ডেলা খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো অস্থিরভাবে পাক খাচ্ছে আর ফুঁসছে।

পশ্চিমের আলো একপাশ থেকে এসে ওটার ওপরে পড়েছিল। তাতে মেঘটাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

অদ্ভুত বলতে কীরকম? কালীপুজোর সময় আকাশে হাউই ওড়ে দেখেছেন? একরকম হাউই আছে যেগুলো আকাশে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটা উজ্জ্বল সাদা আলোর কণা ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে, আর হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে নামতে থাকে নীচের দিকে।

এই মেঘটার ভেতরেও সেরকম কিছু একটা হচ্ছিল। ওটার ভেতরে যেন অসংখ্য বিদ্যুতের কণা জ্বলছিল আর নিভছিল।

মেঘটা ভাসতে-ভাসতে আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ল। তারপর পেয়ারা গাছটার ডালপালা-পাতার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দিনের আলো মরে আসছিল। তাই মেঘটাকে আর স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে হঠাৎই নজরে পড়ল, একটা বুলবুলি পাখি নেই। চঞ্চল হয়ে এ-ডাল সে-ডাল করতে-করতে কখন যেন উড়ে পালিয়েছে। আপনি তো জানেন, বুলবুলি পাখি জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। তাই ভাবলাম, অন্য বুলবুলিটা এখনই উড়ে চলে যাবে সঙ্গীর কাছে।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। বরং একটা চিৎকার কানে এল—কোনও পাখির কর্কশ চিৎকার। বেড়াল পাখির ছানা চুরি করতে এলে মা-পাখি যেমন কর্কশ চিৎকার করে অনেকটা সেইরকম। আর তারপরই দেখলাম, অন্য বুলবুলিটা গাছ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাছটাকে ঘিরে পাগলের মতো এলোমেলোভাবে উড়তে লাগল, আর ডাকতে লাগল।

সে-ডাক আমি চিনি। কারণ, আমি খুব খুঁটিয়ে পাখি দেখি, পাখির আচার-আচরণ লক্ষ করি। হারানো সঙ্গীর খোঁজে বুলবুলি অনেক সময় এরকম করে।

শিবানী মুনমুনকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছিল, আর মুখ তুলে বুলবুলিটার অদ্ভুত আচরণ দেখছিল।

বাড়িতে ঢোকার সময় শিবানী আমাকে বলল, 'দেখেছেন, বাবা, পাখিটা কেমন করছে!'

আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম।

ওরা ভেতরে চলে যাওয়ার একটু পরেই পাখিটা উড়ে কোথায় চলে গেল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় কালো ধোঁয়ার মেঘটাকেও আর ঠাহর করতে পারলাম না।

দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে এরকম ভেসে থাকা ছোট-ছোট মেঘের টুকরো দেখেছি। অবশ্য ওগুলো মেঘ নয়—কুয়াশা। গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলে কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে একটু বাড়তি শীত। এই কালো মেঘের টুকরোটা আমাকে দার্জিলিঙের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এমন সময় আমি একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পেলাম। আচমকা একটা শীত আমাকে কাঁপিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে উঠে ঘরে চলে এলাম। তখন বুঝিনি, আমার পিছু-পিছু আরও একজন কেউ ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে।

সেটা বুঝলাম পরদিন রাতে।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। রাত তখন ক'টা হবে? এগারোটা-সওয়া এগারোটা। রুনু, শিবানী, প্রমিতারা সব শুয়ে পড়েছে। বনানী তখন রান্নাঘর শেষবারের মতন গুছিয়ে নিচ্ছে। ও প্রমিতার কাছে শোয়। আমি ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে হালকা বিছানা পেতে শুই। তো চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ডাইনিং স্পেসের সিলিং-এর দিকে আমার চোখ চলে গিয়েছিল। তখনই খেয়াল হল, সিলিং-এর এক কোণে যেন একটুকরো কালচে ধোঁয়া জমাট বেঁধে রয়েছে। ধোঁয়া বা মেঘ বা ছায়া যা-ই বলুন, ওটার কোনও নির্দিষ্ট শেপ ছিল না। দেওয়ালের কোণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কেমন যেন লেপটে ছিল। অনেকটা ড্যাম্পের ছাপের মতন।

আমি সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘরে চলে এলাম। ছায়াটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ওটাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। না, তেমন কোনও ব্যাপার আমার নজরে পড়ল না। শুধু মনে হল, দেওয়ালের গায়ে লেপটে ওটা যেন সামান্য নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক অ্যামিবার মতন।

বনানী আমার বিছানা পাততে এল। ওকে ব্যাপারটা বললাম, আঙুল তুলে দেখালামও।

ও খুব একটা আমল দিল না। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ওটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একপলক কী দেখল ও-ই জানে। তারপর বলল, 'ও কিছু নয়, ঝুলের দাগ পড়েছে। তোমাকে বললাম রান্নাঘরে একটা এক্‌জস্ট ফ্যান লাগাও, তা আমার কথা শুনলে না। ও পরে একদিন আমি সন্ধ্যার মাকে নিয়ে ঝুলঝাড়ু দিয়ে সাফ করে দেব। এখন শোবে এসো।'

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু খচখচানিটা মন থেকে গেল না। কেমন যেন মনে হল, কাল সকালে উঠে ওই কালচে ছোপটাকে ওখানে আর দেখতে পাব না।

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, আমার ভাবনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি হয়ে গেছে। এতে আমার স্বস্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। ছায়াটা এবার কোথায় কীভাবে দেখা দেবে সে-নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচ দিন পর ছায়াটা সাঙ্ঘাতিকভাবে জানিয়ে দিল, ও আছে। চলে যাওয়ার জন্যে ও আমার বাড়িতে এসে ঢোকেনি। কিন্তু আমার বাড়িটাই কেন যে ওর পছন্দ হল! পরে অবশ্য বুঝেছি, শুধু আমার বাড়িটা নয়—আমাকেও ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই যাবে না। কেন তা জানি না।

আমাদের বাড়ির রোজকার নোংরাগুলো পলিথিনের প্যাকেটে করে সামনের সরু একটা রাস্তায় ফেলা হয়। ওখানে আরও দু-চারটে বাড়ির আবর্জনা এসে পড়ে। সেগুলো ফেলামাত্রই পাড়ার দুটো বেড়াল আর একটা নেড়ি কুকুর সেখানে এসে হাজির হয়। তারপর প্যাকেটগুলো নিয়ে টানহ্যাঁচড়া করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাঁটা-কুটো খায়।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, আবর্জনার প্যাকেটগুলো জায়গা মতো আর পড়ছে না। কিংবা বলা যায়, পড়ার পরই ওগুলো নিয়ে কেউ চম্পট দিচ্ছে। এ-নিয়ে কাউকে কিছু বলার আগেই আর-একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম।

আমার বাড়ির পেছন দিকটায় একটা তেঁতুল গাছ আছে। তার পাশ ঘেঁষেই আমার সেপটিক ট্যাঙ্ক। তো মাঝে-মাঝেই আমি বাড়ির চৌহদ্দি ঘুরে তদারকি করি, সাফসুতরো করি। সেদিন করতে গিয়ে দেখি তেঁতুল গাছটার গোড়ায় একরাশ আবর্জনা ছড়ানো। প্যাকেট ছিঁড়ে কেউ ওগুলোর মধ্যে থেকে পাগলের মতো খাবার খুঁজে বেড়িয়েছে। সন্দেহ করলাম, এ হয়তো কাকের কাণ্ড। আবার বেড়াল-কুকুরও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করলাম, ছড়ানো আবর্জনায় মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় এক কণাও নেই। বরং ভাত-তরকারি আর রুটির টুকরো অল্পবিস্তর পড়ে আছে। কাক-বেড়াল-কুকুর হলে মনে হয় না, এগুলো পড়ে থাকত। তা ছাড়া এ-জায়গাটায় কখনও আবর্জনা ফেলা হয় না বলে ওরা বোধহয় এদিকটায় আসেনি।

ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা যে হয়নি, তা নয়। তবে খুব বেশি আমল দিইনি। এর দিনতিনেক পরে ঘটে গেল সেই অদ্ভুত ঘটনা।

সেদিন রাত আটটা নাগাদ লাল্টু ওর বন্ধু দেবাশিসকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। আমিই আসতে বলেছিলাম—হাজার দশেক টাকা শোধ করব বলে।

আমরা তিনজনে ড্রইং-ডাইনিং-এ বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছি, মুনমুন হঠাৎ আমার

কাছে এল। ওর পেছন-পেছন ঢুকে পড়ল একটা বেড়ালছানা। ধবধবে সাদা এই ছোট্ট বেড়ালটা দিন কুড়ি-পঁচিশ ধরে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। মুনমুন ওকে শুধু খাওয়াতে চায়। বেড়ালছানা ঘাঁটে বলে বউমা মাঝে-মাঝেই ওকে বকুনি লাগায়।

মুনমুন আমার কাছে এসেই 'দাদান, ম্যাঁওকে খেতে দাও' বলে সামনের প্লেট থেকে থাবা দিয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিল। বেড়ালছানাটা তখন লালটু আর দেবাশিসের প্লাস্টিকের চেয়ার ঘিরে লাফাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে।

লালটু মুনমুনকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছিল। মুনমুন পাকা বুড়ির মতো হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে বলল, 'আগে ম্যাঁওকে খেতে দিই...।'

ঠিক তখনই শিবানী মেয়েকে ডাকতে-ডাকতে ঘরে এসে ঢুকল।

আমি চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, টিভির টেবিলের নীচের অন্ধকার থেকে একটা অন্ধকার ছায়া গড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। মেঝেতে যেভাবে জল গড়ায় ঠিক সেইভাবে তরল কালো মেঘটা মোজেইক করা মেঝের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে আসতে লাগল।

লালটুদের আমি ওই ছায়া বা মেঘের ব্যাপারটা বলিনি। কারণ, বললেও হয়তো ওরা বিশ্বাস করত না। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওটা এভাবে দেখা দেবে আমি ভাবিনি।

কথা বলতে-বলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। লালটু সেটা লক্ষ করে জিগ্যেস করল, 'কী হল, অশেষদা?'

আমি কোনও শব্দ না করে আঙুল তুলে ইশারা করলাম কালো ছায়াটার দিকে।

লালটু আর দেবাশিস সেদিকে তাকাল কিন্তু ঠিকমতো কিছু ঠাহর করতে পারল না।

লালটু শুধু বলল, 'আপনার মোজেইকটা ওই জায়গায় কেমন কালচে হয়ে গেছে...।'

আর ঠিক তখনই খেলতে-খেলতে বেড়ালছানাটা ওই কালো ছায়াটার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

একটা কালো চাদর হঠাৎ করে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার মতো অন্ধকার ছায়াটা বেড়ালছানাটাকে চোখের পলকে সাপটে নিল।

শিবানী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। দেবাশিসের হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। লালটু চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে যে-কোনও ধরনের একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

আর আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

কারণ, বেড়ালছানাটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর 'ওঁয়া-ওঁয়া' মরণ-

চিৎকার আমাদের সকলের কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল।

আমার বুলবুলি পাখিটার কথা মনে পড়ে গেল। পাখিটার উধাও হওয়ার রহস্য সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ, এই মুহূর্তে, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছিলাম।

শুধু এই ভয়ঙ্কর সত্যিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথা কাজ করছিল না। রেল-লাইন দিয়ে মেল ট্রেন ছুটে গেলে লাইনের দু-ধারের বাড়ির জানলা-দরজা যেরকম খটাখট করে কেঁপে ওঠে, আমার হাত-পা ঠিক সেইরকম কাঁপছিল। তবে পা দুটো মেঝেতে অসাড় হয়ে গেঁথে গিয়েছিল। আর শিবানীকে কিছু একটা বলতে চেয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হাত দুটো শূন্যে উঁচিয়ে নাড়তে চেষ্টা করছিলাম।

শিবানীর ভয়ানক চিৎকার শুনে রুনু, প্রমি, আর বনানী ছুটে এসেছিল এ-ঘরে। কিন্তু তখন মেঝের ওপরে শুধু একটা কালো ধোঁয়ার তাল পাক খাচ্ছে।

লালটু কোনওরকম হাতিয়ার খুঁজে না পেয়ে ধোঁয়ার তালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেবাশিস 'লালটু! লালটু সরে আয়—' বলে ওকে হাত বাড়িয়ে থামাতে চেষ্টা করেছিল। খামচে ধরেছিল লালটুর জামা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লালটুর জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল দেবাশিসের হাতে। আর লালটুর শক্তপোক্ত দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দ হল। ও যন্ত্রণায় 'উঃ' শব্দ করে উঠল।

দেবাশিস আর রনিত লালটুকে ধরে তুলল। ততক্ষণে ছায়াটা ফিকে হয়ে গিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

আমরা অতগুলো মানুষ কিছুই করতে পারলাম না। বেড়ালছানাটার চিৎকার কমজোরী হতে-হতে হঠাৎই থেমে গেল। ওটার শরীরের এক কণাও আর চোখে দেখতে পেলাম না।

ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানের মতো চুপচাপ হয়ে গেল। শুধু মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে মুনমুন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পর রনিত আমার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, বাবা? এসব কী হল?'

আমি বড়-বড় শ্বাস টেনে হাঁফাচ্ছিলাম। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বললাম, 'জানি না।'

বনানী আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিল। লালটু আর দেবাশিস আমাকে ঘিরে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবানী মুনমুনকে কোলে তুলে নিল।

নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার পর ওদের ছায়ার ব্যাপারটা বললাম। প্রথমদিনের সেই বুলবুলি পাখির ঘটনা। তারপর আবর্জনা থেকে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় উধাও হওয়ার ব্যাপার। আর বললাম বাড়ির আনাচেকানাচে ওটার

ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা।

ওরা সবাই শুনল। কিন্তু তক্ষুনি কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর লালটু বলল, 'অশেষদা, আপনি বিপত্তারিণীর পুজো দিন।'

আমি আর বনানী ধর্মভীরু মানুষ—দেব-দ্বিজে যথেষ্টই ভক্তি আছে। তাই লালটুর প্রস্তাবে সায় দিলাম।

দেবাশিস বলল, 'অশেষদা, দিনের বেলায় ছায়াটাকে একবার খুঁজে দেখলে হয় না!'

'কেন, খুঁজে পেলে কী করবি?' লালটু জানতে চাইল।

দেবাশিস মাথা খাটাতে বেশি ভালোবাসে। ভেবেচিন্তে ধীরে-ধীরে কথা বলে। আর লালটু মাথাও খাটায়, সেই সঙ্গে শরীরও। ও সবসময়েই কিছু একটা করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেবাশিস বলল, 'খুঁজে পেলে ওটার ওপরে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেব।'

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম : যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে কি আগুনে পোড়ানো যায়!

লালটু বলল, 'পেট্রল ঢেলে কিছু করা যাবে কি না জানি না—তবে খুঁজে দেখা যেতে পারে।'

দেবাশিস জিগ্যেস করল, 'অশেষদা, কালো মেঘটা ঠিক কোনদিক থেকে ভেসে এসেছিল বলতে পারেন?'

'পুকুরের দিক থেকে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকার পর লালটু বিড়বিড় করে বলল, 'ওদিকটায় প্রায় মাইলদেড়েক দূরে একটা কবরখানা আছে। এই ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করে কিছু করা যাবে না। অশেষদা, আপনি বিপত্তারিণীর পুজো করুন—তারপর দেখুন কী হয়।'

আরও খানিকক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর লালটুরা চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, কাল দুপুরে দল বেঁধে ওরা ছায়াটাকে খুঁজতে আসবে।

সে-রাতে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। কানের কাছে শুধু বেড়ালছানাটার 'ওঁয়া-ওঁয়া' চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে বেড়ালছানাটার বদলে ওটা মুনমুনের কান্নাও হতে পারত। ঈশ্বর মুনমুনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এ-কথা ভাবতেই আতঙ্কের একটা হিম প্রবাহ আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। মনে হল, কালো ছায়াটার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না।

পরদিন দুপুরে লালটুর দলবল এল আমার বাড়িতে। তন্নতন্ন করে কালো ছায়ার দলাটাকে খুঁজল ওরা। কিন্তু সমস্ত খোঁজাখুঁজিই সার হল। ওটার কোনও হদিস পাওয়া গেল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে, সন্ধে ছ'টা-সাড়ে ছ'টা নাগাদ, ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। ওটা কোথায় লুকিয়ে ছিল জানেন! শুনলে আপনার গা ঘিনঘিন করে উঠবে।

আমি তখন বাথরুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎই দেখি পায়খানার প্যানের গর্ত থেকে এক দলা কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। গাঢ় কালো ধোঁয়াটার ভেতর থেকে যেন একটা চাপা রাগ ফুটে বেরোচ্ছিল। আর বাথরুমের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ওটার ভেতরে বিন্দু-বিন্দু কয়েকটা আগুনের ফুলকি বালির কণার মতো চিকচিক করছে।

সাপের ছোবল মারার ভঙ্গিতে ধোঁয়ার একটা অংশ সরু হয়ে আমার দিকে ছিটকে এল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বাথরুম থেকে একরকম পালিয়েই এলাম।

রথের পরে শনিবার বা মঙ্গলবার দেখে সাধারণত বিপত্তারিণীর পুজো হয়। কিন্তু আমার মনে হল, সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে পুজো আমাদের বোধহয় আর করাই হবে না। তাই পাড়ার এক ঠাকুরমশাইকে ধরে জোর করে একটা দিন ঠিক করে বিপত্তারিণীর পুজো করলাম। কিন্তু অবস্থা একটুও বদলাল না। ছায়াটাকে মাঝে-মাঝেই দেখা যেতে লাগল।

রনিত, প্রমিতা, বউমা—ওরা সবাই মিলে আমাকে চাপ দিতে লাগল। বলল, বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু চাকরি-জীবনের পয়সা তিলতিল করে জমিয়ে, ধার নিয়ে, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রম করে এ-বাড়ি আমি তৈরি করেছি। সে-বাড়ি এক কথায় বেচে দেব! তা ছাড়া এখন এই অভিশপ্ত বাড়ি কিনবেই বা কে!

আমি ওদের কথায় রাজি হতে পারলাম না। ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার চাপা মন কষাকষি চলতে লাগল। রাতের ঘুম দিনের শান্তি—সব উবে গেল। আমার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে, কষ্ট দেখে, বনানীও খুব মনমরা হয়ে পড়ল। ঠাকুরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, আর মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদতে লাগল। আমি ভেতরে-ভেতরে শেষ হয়ে যেতে লাগলাম।

এরপর একদিন আর-একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হল।

বিকেল গড়িয়ে সবে সন্ধে হচ্ছে। শিবানী রান্নাঘরে চা করছিল। বনানী মুনমুনের একটা ছেঁড়া জামায় ছুঁচের ফোঁড় দিচ্ছিল। মুনমুন আমার সঙ্গে ড্রইং-ডাইনিং-এ বসে টিভি দেখছিল। আর প্রমি আমাদের সামনেই মেঝেতে বসে একগাদা অডিয়ো ক্যাসেট নিয়ে তার কী একটা লিস্ট তৈরি করছিল।

হঠাৎই শিবানীর ভয়ঙ্কর চিৎকারে আমরা আপাদমস্তক কেঁপে উঠলাম। ও যেন অন্ধ আতঙ্কে পাগল হয়ে একটানা মরণ-চিৎকার করে চলেছে। তারই মধ্যে বাসনপত্র ছিটকে পড়ার শব্দ হল। কিছু কাপ-প্লেট বোধহয় ভাঙচুর হল।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। তারপরই

আমরা ছুট লাগালাম রান্নাঘরের দিকে।

গিয়ে যা দেখলাম সেটা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

দোলের সময় কালো রং মেখে ভূত হলে যেমনটি দেখতে হয় শিবানীর অবস্থা অনেকটা সেইরকম। ওর ফরসা শরীরে, শাড়িতে, ব্লাউজে, সর্বত্র হতচ্ছাড়া কালো ছোপ। তবে ও নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল না। শূন্যে ওর দেহটা পাক খাচ্ছিল, লাট খাচ্ছিল, আর ও হাত-পা ছুড়ছিল। সাঁতার-না-জানা মানুষ সাগরে ভেসে গেলে বাঁচার চেষ্টায় যেভাবে হাত-পা ছোড়ে ঠিক সেইরকম। সোজা কথায়, ওই ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়ার তালটা শিবানীকে সাপটে ধরে যেন চেটেপুটে গিলে খাচ্ছিল।

আমাদের সবায়ের চিৎকারে এক কানফাটানো হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আমি, বনানী, আর প্রমি শিবানীর শাড়ি-জামাকাপড় হাত-পা খামচে ধরে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি টানতে শুরু করলাম। ওরই মধ্যে প্রমি আর বনানী হাউমাউ করে কাঁদছিল, আর মুনমুন ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে 'মা! মা!' বলে চিৎকার করছিল।

কালো ছায়াটার শরীর থেকে একটা হিসহিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি এতটুকুও ভয় পাইনি। বরং আমার ভেতরে একটা বেপরোয়া রাগ আর জেদ টগবগ করে ফুটছিল।

রান্নাঘরের বন্ধ জায়গায় তুমুল লড়াইয়ের পর শিবানীকে আমরা বাঁচাতে পারলাম।

কালো ছায়াটা আচমকা শিবানীকে ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চম্পট দিল। শিবানীর শরীরটা হাতদুয়েক ওপর থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। ওর নাকের ডানদিকের ফুটো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। বেশবাস অগোছালো। দু-চোখ ভয়ে বোজা। ও বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল আর থরথর করে কাঁপছিল।

প্রমি আর বনানী ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছিল আর ওকে বারবার ডাকছিল : 'বউদি! বউদি!', 'শিবানী, শিবানী!'

আমি বনানীকে চেঁচিয়ে বললাম, 'মুনমুনকে ধরো! শিবানীর চোখে-মুখে-মাথায় জল দাও। আমি এক্ষুনি বীরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি!'

ডাক্তার-ওষুধ করে প্রায় তিনদিনের চেষ্টায় শিবানীকে ভালো করে তুললাম। ও বলল, চা-পাতা রাখার কৌটোর ঢাকনা খুলতেই ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা কালো ছায়াটা ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কথাটা শুনে আমি হঠাৎই কেমন শিউরে উঠলাম।

শিবানীর দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের সংসারে চিড় ধরে গেল। সেদিন রুনু অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর শিবানীর অবস্থা দেখেশুনে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আমাকে ও সাফ জানিয়ে দিল শিবানী একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওরা আমার অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবে না।

চার-পাঁচদিন ধরে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি চলল। আমি একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলাম। কেউ একশোটা কথা বললে হয়তো একটা কথা বলি। আমার আর কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। বাঁচার ইচ্ছে একেবারে উবে গিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা রনিত ওর বউ আর মেয়েকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, মুখ তুলে তাকালাম। দেখি ওরা স্নান-টান সেরে সেজেগুজে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে।

'বাবা, আমরা চলে যাচ্ছি।' মেঝের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় বলল রুনু। তারপর একটু থেমে সময় নিয়ে : 'তোমরাও চলো। মা-কে বলেছি—মা, প্রমি—ওরা রাজি আছে...।'

'তা হলে তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও—।'

এ-কথা বলে আমি আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

প্রমি আর বনানী বোধহয় পরদার আড়াল দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জবাব শুনে সামনে বেরিয়ে এল।

বনানী আমার কাছে এসে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার হাত দুটো চেপে ধরে কান্না-ভাঙা গলায় মিনতি করে বলল, 'তুমি কেন ছেলেমানুষের মতো জেদ করছ! এ-বাড়িতে থাকলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ওই শয়তান ছায়ার সঙ্গে লড়ে আমরা কেউ পারব না। তোমাকে কত করে বোঝাচ্ছি...তুমি কি কিছুতেই নিজের ভালো বুঝবে না!'

আমি পাথরের মতো বসে রইলাম। জানলা দিয়ে বাইরের গাছপালা আর আকাশ দেখছিলাম।

এবার প্রমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল।

'বাবা!'

আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে-মুখে একটা জেদী ছাপ। ও আমার ধাত পেয়েছে।

'বাবা, মরতে আমি ভয় পাই না। তবে এভাবে মরার কোনও মানে হয় না। এখানে থাকলে আমাদের সবার ক্ষতি হবে। তুমি কি তাই চাও?'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম : 'না—চাই না। তাই তো বলছি, তোমরা সবাই চলে যাও—এ-বাড়িতে আমি একা থাকব। আমি এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব।'

প্রমিতা বোধহয় বুঝতে পারল আমার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনানীকে বলল, 'মা, চলো—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বনানী জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'না রে, আমার আর যাওয়া হবে না। তোরা যা—।'

অনেক টানাপোড়েন আর কান্নাকাটির পর ওরা চলে গেল। শুধু বনানী ওর একগুঁয়ে স্বামীটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল। আমরা দুটি প্রাণী ওই বাড়িতে রয়ে গেলাম। আর ছায়াটাও রয়ে গেল।

বনানী ঠাকুর-দেবতা নিয়ে সময় কাটায়। আর সুযোগ পেলেই আমার মেজাজ বুঝে পুরনো অনুরোধটা করে : 'চলো, এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

নতুন ধরনের দুর্ঘটনা আর না হলেও একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। ছায়াটা সবসময় আমার কাছাকাছি থাকে। যখন-তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখা দেয়। আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে। যেন কিছু একটা করতে চায়। সেটা করবে না কি ভাবছে। তখনও বুঝিনি ওর মতলবটা কী। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাইরের বাগানে দু-একটা পাখি মাঝে-মাঝে উধাও হচ্ছিল। মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় আগের মতোই গা-ঢাকা দিচ্ছিল। তবে এইসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ছায়াটাকে আমরা বন্দি করতে চাইতাম বটে, তবে তার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি আর বনানী পাড়ার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ছোট্ট বাড়িটায় আমরা দুজনে মুখ বুজে দিন কাটাই। প্রমিতা বা রনিতদের কখনও আসতে বলি না। ওরা কেউ ফোনে খবর নিলে দায়সারা ঠাণ্ডা উত্তর দিই।

এরকম একটা অবস্থা যখন চলছে, তখন এক অমাবস্যার রাতে ছায়াটাকে আমি বন্দি করতে পারলাম। বনানী ব্যাপারটা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরে, ধীরে-ধীরে, ব্যাপারটাকে সইয়ে নিয়েছে। আমিও সইয়ে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি, এটাই আমার নিয়তি।

একদিন রেডিয়োতে আপনার একটা ইন্টারভিউ শুনলাম। আমার খুব ভালো লাগল। তখনই মনে হল, আপনাকে আমার ব্যাপারটা আমি জানিয়ে যাব। অন্তত একজন ব্যাপারটা জানুক, যে এটা আগাপাস্তলা বিশ্বাস করবে।

তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আপনার ফোন নাম্বার জোগাড় করেছি।

এরপর তো আপনি সব জানেন!

অশেষ শিকদারের মুখটা ভীষণ বিষাদগ্রস্ত আর করুণ দেখাচ্ছিল। কাহিনী শেষ করে তিনি যেন কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশেষবাবুও। ওঁদের দুজনের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে কুয়াশা তৈরি করছিল। প্রিয়নাথ কালো ছায়াটাকে চোখের সামনে দেখতে চাইছিলেন। তাই মনে-মনে ধোঁয়াটার রং কালো করে দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'শেষের ব্যাপারটা তো আপনি ঠিক খুলে বললেন না! ছায়াটাকে কী করে আপনি বন্দি করলেন?'

অশেষ শিকদার মলিনভাবে হাসলেন। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'ছায়াটাকে আমি ঠিক বন্দি করিনি। বরং বলতে পারেন, ওটা নিজেই ধরা দিয়েছিল...' কথা বলতে-বলতে চোখের চশমাটা খুললেন অশেষবাবু, টেবিলে নামিয়ে রাখলেন : 'আপনাকে ব্যাপারটা দেখাই, তা হলে বুঝতে পারবেন...।'

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন অশেষ শিকদার। ওঁর বড়-বড় চোখ দুটো ধীরে-ধীরে ঘোলাটে হয়ে গেল। তারপর একটা গাঢ় কালো ছায়া কোথা থেকে এসে ওঁর চোখ দুটো ঢেকে দিল।

অবাক হয়ে প্রিয়নাথ দেখলেন, একটা মানুষ—অথবা, মানুষের ধ্বংসস্তূপ—কুচকুচে কালো রঙের দুটো আয়ত চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে-চোখের সবটাই চোখের মণি—সাদার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই।

প্রিয়নাথ ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলেন।

অশেষবাবু এবার হাঁ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জমাট কালো ধোঁয়া ওঁর মুখের গহ্বর থেকে পাক খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই ধোঁয়ার ভেতরে বালির কণার মতো চিকচিক করছে কয়েকটা সাদা আলোর ফুলকি।

'বুঝতেই তো পারছেন! শেষ পর্যন্ত আমার শরীরের ভেতরে আস্তানা গেড়েছে ওই কালো ছায়াটা। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই কোথাও যাবে না। হয়তো এভাবেই তিলতিল করে আমাকে শেষ করবে।' অশেষবাবু কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কান্না জড়ানো গলায় বললেন, 'আপনার কাছে কোনও সাহায্য আমি চাইতে আসিনি, মিস্টার জোয়ারদার। আমার অবস্থা এখন সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। শুধু—শুধু আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে শোনাতে এসেছিলাম। আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম ঘটনার কথা আপনি কখনও শোনেননি—দেখেননি।'

অশেষবাবুর কথার তালে-তালে ওঁর মুখ থেকে কালো ধোঁয়ার ঝলক বেরিয়ে আসছিল। কালো ধোঁয়ার প্রকাণ্ড বেলুনটা তখন প্রিয়নাথের মাথার ওপরে ভাসছিল, দুলছিল। অশেষ শিকদার কালো চোখ মেলে সেই বেলুনটাকে দেখছিলেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন।



